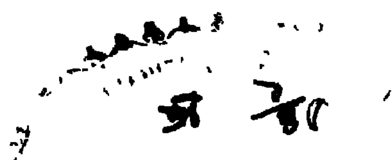
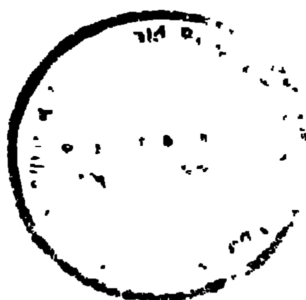
যায় যদি যাক



অচিন্ত্যকুমার সেন



ডি এম লাইব্রেরি
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫২ জ্যৈষ্ঠ

—প্রকাশক—

গোপালদাস মজুমদার

ডি এম লাইব্রেরি

৭২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা

—মুদ্রাকর—

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়

৫ চিন্তামণি দাস লেন

কলিকাতা

দাম তিন টাকা

১৩৪৮-৫০ সালের

একটি জ্বালাময় কাহিনী

যায় যদি যাক।

১

সবাই পালাচ্ছে, উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। যত বাড়ির মোটর আর ট্যাক্সি, ছ্যাকড়া গাড়ি আর ফিটন, রিকশা আর ঠেলা—সব চলেছে কোনো-না-কোনো স্টেশনের দিকে, উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমে পূবে। হাওড়া, শেয়ালদা, শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া, মাঝের হাট, কালিঘাট, বালিগঞ্জ, ঢাকুরে। কেউ-কেউ বা সিধে হাঁটা-পথে, বর্ধমানের রাস্তা, ব্যারাকপুরের রাস্তা, ডায়মণ্ডহারবারের রাস্তা। চলেছে এলোধাবাড়ি, উঠি-কি-পড়ি মরি-কি-বাঁচি হয়ে। বাঘের তাড়ায় হরিণের পালের মত। দিশ-বিদিশ নেই, বিচার-বিতর্ক নেই, সব বেহেড, বেহুঁস। ছ্যাকড়া গাড়ির ভাড়া পাঁচ থেকে পনেরোয় এসে উঠেছে, ট্যাক্সির ভাড়া পনেরো থেকে পঞ্চান্ন, তবু চলো এই আতঙ্কপুরী থেকে। টাকায় কী হবে যদি প্রাণ না থাকে, প্রাণ থাকে তো হাত-পা না থাকে, হাত-পা থাকে তো ঘিলু না থাকে মস্তিষ্কে। হতকুচ্ছিতের মত মরলুম, হয়তো বাড়ি চাপা পড়ে, হয়তো বা দরজা-খোলা-না-পাওয়া নিরাশ্রয় রাস্তায়। ফুটপাতে শুয়ে পড়লুম অতর্কিতে, পা বাড়িয়ে দেখলুম মুণ্ডুটা ফুটপাতের নিচে পড়েছে গড়িয়ে। হয়তো নাড়িভুঁড়ি পড়েছে বেরিয়ে, কাক খাচ্ছে ঠুকরে-ঠুকরে, হাত বাড়িয়ে তাড়াতে পারছি না। কিংবা বেঁচে গেলুম হয়তো, কিন্তু হাবা-কালা হয়ে গেলুম।

শুধু কি তাই? খাবে কি? জল কোথায়? রাত্রে কাণ্ড হলে হাঁসপাতালে যাবার পর্যন্ত সুবিধে পাবে না। হাঁসপাতাল। শ্মশান যাবার পথ পাও কিনা তারই বা ঠিক কি! তারপর, মেয়েরা! ওদের কি

দুর্গতি হবে। কেউ অটুট, আস্ত থাকবে না। দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে কাঠ হয়ে? দরকার নেই, পালাও। পালাও।

হ্যাঁ, পালাচ্ছে সবাই। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছে। জীবনভোর যত কল্পনা করেছিল, ঘর-দোর, টাকা-কড়ি, ব্যবসা-পসার—সব ছত্রখান তছনছ করে দিয়ে পালাচ্ছে। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে থাবা-থাবা। কাগজের টাকায় কি হবে, দেখ, রুপোর টাকা পাও কি না, তামার পয়সা, নিদেন মেকি নিকেলের রেজগিরও দাম অনেক। তাই, যে যত পারছে টাকা ভাঙিয়ে নিচ্ছে। বাড়ি-ঘরের কি হবে? থাকবে তালা-বন্ধ হয়ে। দেখছে, এমন কাউকে পায় কিনা যে বিনা ভাড়ায় জিম্মা নিতে রাজি। এ-আর-পি পাওয়া গেলেই সব চেয়ে ভাল। যদিও ঠাট্টা করে এ-আর-পির নাম রেখেছে,"আয় রে পালাই"। কি হবে বাড়ি-ঘরের মায়া করে। মমালয় না যমালয়। আর, আমাদের তা ভাড়াটে বাড়ি। যাক ও ধূলিসাৎ হয়ে। যদি কোনো দিন ফের ফিরতে পাই তখন যেন এসে দেখি বাড়িটা ও তাবি বাড়িওয়ালাটা অন্তত নেই। জানলার কাঁচ সরাবার কথা বলছে, যাবার আগে এ-বাড়ির শার্সির কাঁচগুলো গুঁড়ো করে না দিয়ে যাই তো কি।

অত মাল নিয়ে কি হবে। গিন্নিরা গয়না, কর্তারা নগদ টাকা। ওই হলেই যথেষ্ট। হ্যাঁ, শীতের কাপড় যত পারো নিতে হবে বৈ কি। লেপ তোষক, বালিশ, পাশ-বালিশ—কোনটা তুমি ফেলবে? বা, বাসন নিতে হবে বৈ কি। বঁটি, শিল-নোড়া, চাকি-বেলুন—কোনটা লাগে না শুনি? হ্যারিকেন, বালতি, মগ—কাকে ফেলে কাকে বাছবে? হেলান-দেয়া একখানা চটের চেয়ার নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। আর, কিছু কয়লা, চাল আর আলু। আর, হ্যাঁ, জলের কুঁজোটা। দারুণ শীতে —মরবার সময়ও প্রাণটা জল-জল করে।

দশ টাকা ভাড়ার ছ্যাকড়া গাড়ি মালের বহর দেখে চোদ্দ টাকা

হাঁকে। শত ঘি ডলেও ষাঁড়ের ঘাড় নোয়ানো যায় না। তবু, মালে হাত লাগাবে না গাড়োয়ান। তার জন্মে আরো এক টাকা শুনগার।

যান-যাত্রা। সার বেঁধে চলেছে, বাড়ির মোটর আর ট্যাক্সি, ছ্যাকড়া গাড়ি আর ফিটন, রিকশা আর ঠেলা, রিজার্ভ-করা বাস আর লরি। রাস্তার আইন মানতে চাইছে না, জাম্ হয়ে যাচ্ছে। এক নিশ্বাস বসে থাকবার কারু ধৈর্য নেই। কলকাতা যে কত কুৎসিত তা এর আগে টের পায়নি কেউ। এটা মিউজিয়ম, ওটা মনুমেন্ট, আঙুল তুলে-তুলে আনাড়ি মেয়েদের দেখিয়েও বিন্দুমাত্র গর্ববোধ করতে ইচ্ছে যাচ্ছে না কারুর। কতক্ষণে এই ইট-কাঠ-সুরকির হাঁড়িকাঠ থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবে ধানখেতের ফাঁকায় বা নদীনালার নিরালায় তারি জন্মে সবাই উন্মুখ। যে লোক ভিড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারছে পায়ে হেঁটে, সেই আগে বাঁচলো, সেই ভাগ্যবান। মিছিমিছি গাড়ি-ঘোড়া করে এই ঝকমারি। কে জানে, এমনি অনড় হয়ে বসে থাকতে-থাকতেই আকাশ চীর্ণ-বিচীর্ণ হয়ে যাবে। কে জানে, হয়তো পুবের আকাশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে ঝাঁকে-ঝাঁকে।

ঝুলন্ত হাওড়ার পুল ভেঙে পড়ল বুঝি যাত্রীর ভারে, শেয়ালদার ভিতরে বাইরে ফুটবলের জনারণ্য। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন পড়ে থাকছে স্টেশনে, উঠতে পারছে না গাড়িতে। মাল-পিছু পাঁচ টাকার কমে কুলি পাওয়া যাচ্ছে না। স্টেশনের গেট খোলাতে যাত্রী-পিছু দশ টাকা করে, ভিতরে ঢুকেই বা লাভ কি, কোনো গাড়িতে তিলধারণের স্থান নেই। আবার ঘুষ দাও, এবার মোটা হাতে, দুশো-পাঁচ শো। খালি-গাড়ি জোড়া হচ্ছে এঞ্জিনের পিছনে, কিংবা ঠেলে তুলে দিচ্ছে মাল-গাড়িতে। গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি, হাঁকাহাঁকি, কামড়াকামড়ি। মালে-মানুষে একাকার। জুতোশুদ্ধ কারুর পা চলে এসেছে মুখের উপর, কারুর মাল নেমে বসেছে এসে ঘাড়ে। কার

কাঁধের নিচে কার হাত কার পেটের নিচে কার পা বোঝবার জো নেই। একটা হাণ্ডুল-বাণ্ডুল অবস্থা। এরি মধ্যে কেউ কাঁদছে তার মালের শোকে। কুলি কোন ফাঁকে ভেগে পড়েছে গা-ঢাকা দিয়ে। কেউ কাঁদছে তার মেয়ের জন্যে। তাড়াতাড়িতে উঠতে পারেনি গাড়িতে।

থার্ড ক্লাশের উপরে যে কোনো দিন ওঠেনি, সে বেপরোয়ার মত আজ ফার্স্ট ক্লাশ রিজার্ভ করছে। ত্রিশ-বত্রিশ মাইলের জন্যে বাস একটা রিজার্ভ করতে যেখানে বড় জোর ত্রিশ টাকা ছিল, সেখানে আজ ন শো। তাই নিঃশব্দে বার করে দিচ্ছে ট্যাঁক থেকে। টাকা বেশি না প্রাণ বেশি। তবু টাকার শ্রাদ্ধ করেও সদ্য-সদ্য বেরুনো যাচ্ছে না। স্টেশনের শেডে, ওয়েটিং রুমে, ফুটপাতে পড়ে থাকছে পালে-পালে, বঞ্চিতের মত, বিতাড়িতের মত। যেন মূল নেই, আশ্রয় নেই। যেন এক দিনে সমাজ থেকে উৎখাত হয়ে গেছে সব। স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে পড়েছে।

আবার সিটি দিয়েছে বুঝি কোনো ইঞ্জিনে। এই প্ল্যাটফর্মে না ও-ই প্ল্যাটফর্মে। ঢিল পড়েছে মৌচাকে। ফটকের কাছে, গাড়ির দরজায়, ঘুষের মাত্রা চড়ে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে, কুলির বুলি উদারা থেকে তারায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। তবু দ্বিধা নেই, দ্বিরুক্তি নেই। শিকের কোনো ফাঁক দিয়ে এ-খাঁচা থেকে বেরুতেই পারলেই হলো। সকলেরই এক উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, উদ্‌ভ্রান্ত ব্যবহার। এক অসহায় ভয়, অসহায় বিক্ষব। একটা বোবা অজ্ঞান।

কোথায় চলেছে এরা? শাখা-শিকড় ছিন্ন করে নিঃস্বের মত কোথায় ফিরে চলেছে? ফিরে চলেছে গ্রামে। যেখান থেকে এক দিন তারা এসেছিল। গড়েছিল শহর, গড়েছিল সভ্যতা। ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা। ঐশ্বর্যের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল রিক্ততা, শান্তির নিচে শোষণ, দয়ার নিচে অবজ্ঞা। যেখানে সমস্ত-কিছু প্রতিষ্ঠা করেছিল

লোভের উপর, স্বার্থের উপর, প্রতিযোগিতার উপর। যেন সব জারিজুরি ধরা পড়ে গেছে। এবার তাই তারা ফিরে চলেছে গ্রামে, গুহায়, আদিম গুহায়, আদিম প্রকৃতিতে। তাঁবু গুটিয়ে ফেলছে। আর ফিরে আসবে না তারা এই ছোট আকাশের সীমার মধ্যে। এই ইটকাঠের কয়েদখানায়।

'এই গাড়ি, এই গাড়ি।'

দরজা খুলবে না কেউ, না খুলুক। জানলা দিয়েই গলাতে হবে ভিতরে। আগে মাল, পরে মেয়েরা। লজ্জার সময় নয় এটা। বীরত্বের সময়। কুলির পাখালিকোল ছাড়া উপায় কি। 'তারপর, এইবার আমি।' জয় মা দুর্গা বলে শ্রীভূষণবাবুও কুলির কোলে উঠলেন। তাঁর এক পাটি জুতো প্ল্যাটফর্মে পা ফসকে পড়ে গেল ও আরেক পাটি জুতো কুলি কায়দা করে খুলে নিলে।

যাক গে, পায়ের নিচে দাঁড়াবার জায়গা পেয়েছেন যে এই ঢের। যারা যেতে পারল না এই ট্রেনে, দরজায়-দরজায় আকুলি-বিকুলি করে মরছে তাদের দিকে তিনি একটি দীর্ঘ অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

২

'তোমরাও চললে নাকি?' পাশের বাড়ির বউটিকে বাঁধাছাঁদা করতে দেখে সেবা জিগগেস করল চেঁচিয়ে। প্রায় ছাইয়ের মত মুখ করে।

জানলায়-জানলায় জানাশোনা। বোঁচকায় গিঁট দিতে-দিতে ও-পারের বউ বললে, 'না গিয়ে আর উপায় কি। খোকার বাবার আফিসে খবর এসে গেছে দু'দিনেই ওরা এসে পড়বে।'

সেবার বুকের মধ্যে ছোট, ঠাণ্ডা একটা ফাঁক হয়ে গেল।

'আমার শ্বশুরের জানো বাঘের ভয়ই বেশি।' বউটি হাত ও মুখ বেঁকিয়ে দৃঢ়তর আরেকটা গিঁট দিলে।

'এ তো, বোমা, বাঘ কোথায়।'

'উনি বলেন, চিড়িয়াখানার সব বাঘ-সিংহ রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে, অনেক দিন পর লোক দেখবে আর থাবা উঁচিয়ে বলবে, হালুম। সে কি ভয়ানক ব্যাপার ভাবো দেখি, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।' আগের চেয়ে বেশি ভারিক্কি মুখে বউটি বললে।

'খোকার বাবা কি করবে?'

'কি করবে মানে? কোঁচায় বেঁধে এনেছিল এবার কাছায় বেঁধে পালাবে।'

'নতুন চাকরি পেয়েছিল শুনেছিলুম—'

'চাকরি। আপিসের রুই-কাৎলারাই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে আর ইনি তো ঘুষো চিংড়ি। কম্মে কুড়ে ভোজনে দেড়ে। বাপের উপর আছে কিনা।' এইবার শেষ গিঁট পড়ল।

'ও মা, তোমরাও চললে নাকি ?' সেবার মা মায়াময়ী পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হাত-পা হঠাৎ ঠাণ্ডা, হালকা হয়ে গেল।

শুধু ওরা কেন ? পনেরো নম্বরের বাড়িও চলেছে। বরদাবাবুদের বাড়ির সামনে পর-পর চারখানা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছে। ভূপালবাবুদের বাড়ির ছাদে শাড়ি শুকোতে দিয়েছিল, না-শুকোতেই তুলে নিচ্ছে চটপট, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে জানলা-দরজা—না, সাইরেন নয়,—ওদেরো গাড়ি জোগাড় হয়েছে, কোনোরকমে গো-গ্রাসে আধসেদ্ধ খেয়ে ওরাও রওনা হল। দুধউলি বকুলমতি, কাঁধে-কাঁধে পুঁটলি চাপিয়ে, বিছে-পৈঁছে বালা-বাজু গায়ে চাপিয়ে চলেছে হাওড়ার বাস ধরতে। মোড়ের হিরণবাবুদের জন্যে ট্যাক্সি এসেছে, ঘাড় নুইয়ে খোঁপা দেখিয়ে-দেখিয়ে পর-পর উঠছে এসে মেয়েরা, সাজগোজের এতটুকু শৈথিল্য করেনি, গালের হাড়ের চূড়ায় মোছা-মোছা তেমনি গোলাপী আভা ফুটিয়েছে। তিনটে গরু ও দুটো বাছুর হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে রামরিচ। শুধু পাঁশুটে গরুটার গলায় পেতলের সেই ঘণ্টাটা আজ আর বাঁধা নেই।

যেমন প্লেগ বা বসন্ত। তেমনি ছোঁয়াচে সেইভয়, যে ভয় যুক্তিহীন, অনির্দেশ। ও পালাচ্ছে, অতএব আমিও পালাই। ওঁরাও যখন পালাচ্ছেন, তখন আর কথা কি, আমাদেরও পালাতে হয়। বড়লোককে দেখে গরিব, কোঠাবাড়িকে দেখে বস্তি, দোকানদারকে দেখে মুটে-মজুর। যে পালাতে পারছে সে জয়ীর মত মুখ করছে আর যে পালাবার পথ পাচ্ছে না সে মুখ করে আছে গরুচোরের মত। 'এখনো যাননি ?' যেতে-যেতে গাড়ি থেকে বিজ্ঞ মুখ বাড়িয়ে জিগগেস করছে সগর্বে, আর এমন একখানা ভাব করছে যেন সাত হাত জলের নিচে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন ওপারে। চারদিকে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার ভাব। চেহারা রুক্ষ, চাউনি হতবুদ্ধির মত। এখানে ফিসফিস ওখানে ফিসফিস। নখের চুলকুনিতে কলকাতার শরীরে বেরুচ্ছে শুধু গুজবের ফুস্কুড়ি।

দুপুরবেলা দেখা করতে এসেছিল সুজন। এ বাড়িতে ওর প্রবেশের পথ প্রশস্ত নয়। লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখা হয়, তাও প্রায়ই চোখের দেখা। এবং সেই দেখাটুকুতেই, আশ্চর্য, সমস্ত জগৎ ভরে উঠে। তবু, ততটুকুতেও শ্রীভূষণবাবুর আপত্তি।

আশা ছিল, আজকের এই বিশ্রী বিশৃংখলার মাঝে কোথাও একটা বড ফাঁক মিলে যাবে হয়তো। চাই কি, আজ হয়তো একটু ছুঁতে পারবে সেবাকে। কে জানে, হয়তো সংবাদের বাইরে চলে যাবে, আর দেখাই হবে না কোনো দিন। ঘটনার ঘূর্ণিপাকে পড়ে কোথায় কে তলিয়ে যাবে ভবিষ্যৎ শূন্যে একটি অক্ষরও কোথাও লেখা নেই।

সেবা আরো বেশি আশা করে ছিল। সে এবার বলবে, দৃঢ় হবে, স্পষ্ট হবে। শুধু স্তব-স্তুতি-আরাধনার পথ আর তার সহ্য হচ্ছে না। ঘুর-পথে ঘোরাঘুরি করে সে হাঁপিয়ে উঠেছে।

'তোমরাও চললে—'

'উপায় কি। তুমি?' সেবার চোখ ঝিকিয়ে উঠল।

'আমি পালাব কেন? আমি যুদ্ধ করব।'

'যুদ্ধ করবে। কি দিয়ে? কলম দিয়ে?' সুজনের পাঞ্জাবির বুক-পকেটে শস্তা ক্লিপে-আঁটা খেলো ফাউণ্টেন-পেনের দিকে ইঙ্গিতটা ঝলসে উঠল।

'হ্যাঁ, কলম দিয়েই। যার যা কাজ তাতে অবিচলিত ভাবে লেগে থাকাই হচ্ছে যুদ্ধ করা। যে আদেশ পালন করে আর যে আদেশের জন্যে অপেক্ষা করে, দুইই সমান সৈনিক। আর, জীবনের শত্রু তো শুধু ঐ বেঁটে-বাঙ্কুররাই নয়, শত্রু হচ্ছে ভীরুতা, শত্রু হচ্ছে আলস্য, শত্রু হচ্ছে হুজুগেপনা। হুজ্জতের বদলে এবার কিছু হিম্মতের দরকার—'

ঢের ওরকম কথা শুনেছে সেবা। কান পচে গেছে শুনতে-শুনতে। বীরত্বের এই ভঙ্গিটা সে দেখতে পারে না।

'তোমাদের ইস্কুল তো বন্ধ হয়ে যাবে।'

'এখনো হয়নি।'

'হতে বেশি বাকি নেই। পাততাড়ি গুটোচ্ছে সব ছেলেরা।'

'গুটোক। তবু আমি এখানেই থাকব। কাজের অভাব হবে না।'

'নেহাতই তবে মরবে।' সেবার নিচেকার চোখের পাতায় মিথ্যে-দিয়ে-মাখা মায়া-ভরা একটি হাসি টলটল করে উঠল।

'মরব। মরতে আমার ভয় করে না। একেক সময় মনে হয় সে না জানি কি মজার জিনিস। কিন্তু বেঁচে থাকাটা জানো, তার চেয়েও মজার।'

'যদি চাকরি-বাকরি না থাকে, না খেতে পেয়ে বেঁচে থাকো, তা হলেও?'

'তা হলেও। বেঁচে থাকা, যে করে হোক, বেঁচে থাকার চেয়ে বড় কীর্তি আর কিছু হতে নেই। আমাদের দেশ বড্ড বেশি মরতে ভালোবাসে। কবিতায়, দর্শনে, ধর্মে, সবখানে ওরা মরতে চায়, মরার ওপরে বেশি মূল্য দেয়। কিন্তু আমরা নতুন যুগের মানুষ, আমরা বাঁচতে এসেছি—'

আবার বক্তৃতা। আবার সব ধার যাবে মুছে, স্নায়ু যাবে স্নিগ্ধ হয়ে।

'তবে আমিও থাকব তোমার সঙ্গে, কলকাতায়।' সেবা প্রায় সুজনের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়াল। তার চুলের একটা গুচ্ছ লাগল সুজনের মুখের উপর। বৃষ্টির নতুন ধারার মত।

বড় অদ্ভুত লাগছিল সেবার এই হঠাৎ ঘন-হয়ে-আসা। সমস্তটা উপস্থিতি অনুকূল উষ্ণতায় গদগদ হয়ে উঠেছে।

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি। আমাকেও বাঁচতে দাও, বাজতে দাও একবার।'

'তোমার বাবা কোথায়?' সুজন ঘটনার ওজন নেবার চেষ্টা করল, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে-জায়গার জ্যামিতি।

'ব্যাঙ্কে গেছেন। টাকা তুলতে।'

'তোমার মা ?'

'বাক্স গুছোচ্ছেন।'

ক্ষণকালিক মুগ্ধতাটা কাটিয়ে উঠেছে সুজন। সাংসারিক হবার চেষ্টা করে বললে, 'এই বিপদের সময় তোমার বাবা-মা তোমাকে ছেড়ে দেবেন ?'

'বিপদ বলেই তো ছেড়ে দেবেন। বাবা কি বলেছেন জানো ?' সেবা তার চোখের দৃষ্টি বিলম্বিত করে তুলল।

'জানি। বলেছেন, ছোটলোকটা যেন এবার বোমায় ব্যোমাকার হয়ে যায়।'

'না। বলেছেন, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বাঁচতুম।'

'সন্দেহ কি।' সুজন হাসল।

'যদি আজই হয়, আজই তিনি দিয়ে দিতে রাজি।'

'কেননা আজই তিনি পালাচ্ছেন। লাগেজ যত কম হয় ততই তো সুবিধে।'

'আরো কি বলেছেন জানো ?'

'জানি। বলেছেন—'

'না, জানো না। বলেছেন, ইস্কুল-মাস্টারই বা মন্দ কি।'

এইখানেই বরাবর আপত্তি ছিল শ্রীভূষণবাবুর। আগে এ-পাড়ায় পাশাপাশি বাসা ছিল সুজনদের। আলাপী ছেলে, কম মাইনেতে চলবে বলে সুজনকে তিনি মাস্টার রেখেছিলেন সেবার জন্যে। কিন্তু ক'দিন যেতে-না-যেতেই ঠাহর করলেন সুজনের লক্ষ্যস্থল বই নয়, ছাত্রীর মুখপদ্ম। ঠাহর করলেন এক হাত আরেক হাতের এলেকায় গিয়ে উঠেছে। ভঙ্গিটা খাড়া নেই, ঢিলে। আলোচনা কূজনের চেহারা নিয়েছে। কথার মাঝে হঠাৎ নেমে এসেছে অকারণে চুপ করে যাওয়া।

অসহ্য মনে হল শ্রীভূষণবাবুর। গৃহশিক্ষক হয়ে এসে ছাত্রীর প্রেমে পড়বে এর রূঢ় অসঙ্গতিটা তাঁকে শুধু পীড়িত নয়, ক্ষিপ্ত করে তুলল। সে-প্রেম বিয়েতে এসে থিতিয়ে পড়বে জেনেও তিনি ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি ব্যাপারটা। সুজনকে তাড়িয়ে তো দিলেনই, দরজা বন্ধ করে দিলেন মুখের উপর। মোটমাট, প্রেম জিনিসটার উপরেই তিনি হাড়ে চটা। বিশেষত যে-প্রেমে রোদের চেয়ে জ্যোৎস্নার ভাবটা বেশি। তেলচিটে যে-প্রেম।

তা ছাড়া সামান্য মাইনের ইস্কুল-মাস্টারের অনেক উপরে তাঁর ইচ্ছা ঘোরাফেরা করছে। মেয়ে তাঁর সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে বাড়িতে। তার মানে, পাশ করতে পারেনি, পারবেও না কোনো দিন, তা তিনি জানেন। মাস্টারির নামে ধাষ্টামি করলে মেয়ে ফেল করবে না তো কি।

আজ এই ঘোর বিপর্যয় তাঁকে কিঞ্চিৎ নড়িয়ে দিয়েছে। জিদের ইস্ক্রুপ দিয়েছে আলগা করে।

কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ।

পড়ন্ত নিশ্বাসটা বুকের মধ্যে চেপে রেখে সেবা বললে, 'নিজেকে এবার ব্যক্ত করো। ঘোষণ করো। জীবনের খুব জয়গান করো শুনি, এবার নিজে রচনা করো সে-জয়গান। একটি বার অন্তত ব্যবহার করো বীরের মত।' অনেকগুলি কথা বলে ফেলে সেবা হাঁপাতে লাগল। নিশ্ছিদ্র দু' হাতে মুখ ঢেকে নিজেকে নিশ্চিহ্নরূপে মুছে দিতে চাইল।

সুজনের গলার আওয়াজে এতটুকু নেশা নেই। বরং যেন হিমাচ্ছন্ন। বরং যেন রেশ লেগে আছে উপহাসের। 'এই দুর্যোগের সময় বিয়ে! তুমি বলো কি সেবা? কারু কোনো নোঙর নেই, বন্দর ছত্রখান, উত্তাল ঝড় উঠেছে আকাশে, এই সময় ঘর-বাঁধার স্বপ্ন! তুমি কি জেগে নেই?'

উঃ, এর পরেও তর্ক, প্ররোচনা! তবু না চাইতেই কথা এল তার মুখে। বললে, 'ভীষণ জেগে আছি। এই দুর্যোগকে শুভযোগে নিয়ে যাব এই আশায়। মরি-বাঁচি, আমরা দু'জন—এই বিশ্বব্যাপী অনুভবে। আর পিছিয়ে যেও না।'

সুজনের গলায় সেই চমৎকার মসৃণতা। 'বিয়ে বোমার মত অমন তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়। ওটা সন্ধির ব্যাপার, শান্ত মাঠের ফসল।' তারপর অবমাননাকর সান্ত্বনার প্রলেপ. 'আমি আছি, তুমি আছ, আজকের দিনে এই সত্য এই অনুভূতিই জাজ্জ্বল্যমান থাক।'

সেবা কাপড় কুঁচোতে লাগল। সুজন গেল মায়াময়ীর বাঁধাছাঁদায় সাহায্য করতে। মায়াময়ী শ্রীভূষণবাবুর মত অত তেড়াবুদ্ধি নয়। নারকেল-কাতা দিয়ে যদি বিছানাগুলো অন্তত বাঁধিয়ে নিতে পারেন তো মন্দ কি।

বারিধি সব বন্দোবস্ত করেছে, ইস্টিশানে, পারঘাটায়, হাঁটা-পথের মোহড়ায়। গরম দুধ, [illegible] জল, পুরি-হালুয়া। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার রেখেছে মোতায়েন। স্ট্রেচারের অভাবে খাটিয়া। হ্যারিকেন গোটাকতক। বিকেলের ট্রেন কতটা লেট করে তার ঠিক কি।

ইভাকুয়িরা গাড়ি-বোঝাই হয়ে আসছে, পা-দানিতে ঝুলতে-ঝুলতে। সামান্য এই গ্রাম্য জায়গাটাও এদের মানচিত্রে আঁকা ছিল ভাবলে আশ্চর্য মনে হয়। আসছে জলপ্লাবনের মত।

যেন বাঁকা শিঙে বুনো মোষ তাড়া করেছে এমন চেহারা। যেন হুলিয়া বেরিয়েছে সবাইর নামে। এত শীতেও যেন ঝলসে গেছে সব। ঝটকানি-ঝাঁকরানিতে কেউ আর আস্ত নেই। চেপটে থেঁতলে গেছে। পোষাকে ছিরি-ছাঁদ নেই, চুল ঝাঁকড়-মাকড়, দুই চোখে ঘুম রয়েছে চটে। চেঁচামেচি, দাপাদাপি, হুড়াহুড়ি। হুটপাট, হুলুস্থুল।

বেশির ভাগই মেয়ে। সকল রকম বয়সের, ফোঁড়া নাকে সুতো বাঁধা থেকে সুরু করে গঙ্গাযাত্রিনী। রোগা, চিমসে, ধুম্বি। বারিধি কোনো মেয়েরই মুখের দিকে তাকায় না, পায়ের দিকে তাকায়। আর পায়ের থেকেই হয়তো দেহের পরিমিতি অনুমান করতে পারে। চেষ্টা না করেই প্রৌঢ়াকে মা ও যুবতীকে দিদি বলতে পারে। মেয়েদেরো তাই তার সান্নিধ্যে নিঃসংকোচ হতে দেরি হয় না। বারিধির সমস্ত সান্নিধ্যটাই সৌহার্দে আর্দ্র। উপস্থিতি অনুগ্র, দাহহীন। পুরুষের উদ্ধতির বিরুদ্ধে মেয়েদের যে-চোখ সর্বদা জেগে থাকে, বারিধি জানে তা নিদ্রাবিষ্ট করে

তুলতে। শুধু মুখের মিষ্টিতে নয়, কাজের মিষ্টিতে। আয়াসকৃত নিস্পৃহতায়। নিয়ত উপকৃত হচ্ছে এই বোধের প্রশ্রয়শীলতায়।

কার ছেলে হারিয়ে গেছে খুঁজে এনে দাও। কার গায়ে ছেঁড়া-খোঁড়াও একটা ধুকড়ি নেই তাকে দাও কম্বল জোগাড় করে। কে বমি স্বরু করেছে তার জন্যে ডাক্তার ডাকাও। চাল-চুলো ঢেঁকি-কুলো বন্দোবস্ত না করে যারা পাগলের মত বেরিয়ে পড়েছে সে-সব হতভম্বের জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করো। যারা যাবে গ্রামের অভ্যন্তরে তাদেব খাওয়ার জোগাড় দেখ। কার কে বাক্স নিল ছিনিয়ে, কার মেয়ের গায়ে কে হাত দিয়েছে, কে কার নাকের উপর ঘুষি দিয়েছে বসিয়ে, তার ফয়সালা করো। ওদিকে কার গা তেতো-তেতো করছে তাকে ওষুধ খাওয়াও। হোঁচট খেয়ে কার পায়ের নোখ গিয়েছে উলটে তার তেলপটি লাগাও। শীতে কাঁপছে হি-হি করে, কুটো-কাটা দিয়ে ধুনি জ্বালো। গায়ে কার খড়ি উড়ছে, তেল মাখিয়ে তাকে চান করাও। হাজার রকমের ঝঞ্ঝাট।

কিন্তু বারিধি এক পায়ে খাড়া। সে সেবাব্রতী।

বিকেলের ট্রেন এল ঝিমোতে-ঝিমোতে, অন্ধকারের ধার ঘেঁসে। আবার সেই মানুষের মাছ-পাতুরি। আঠা দিয়ে আটকানো কাঁঠালের কোয়ার মত। আবার সেই আথাল-পাথাল।` চেঁচামেচি, বকাবকি, খামচা-খামচি।

'কি হয়েছে আপনাদের? উনি কেন অমন করছেন?'

বিমর্ষ মুখে সেবা বলল, 'বাবার সমস্ত টাকা রাস্তায় চুরি গেছে।'

'ছিল কত?'

'আমার সর্বস্ব, বাবা। প্রায় সমস্ত জীবনের উপার্জন। পুলিশ! পুলিশ!' শ্রীভূষণবাবু নিজের আগাপাস্তলা করাঘাত করতে লাগলেন। 'কাল আমি খাব কি? চালাব কি করে?'

'তার জন্যে ভাবতে হবে না। বাড়ি ঠিক আছে আপনাদের?'

কে নিতে এসেছে শ্রীভূষণবাবুদের, কালি-পড়া ফাটা-চিমনির হ্যারিকেন। 'ওরে হরেন, এর চেয়ে যে বোমায় মরা ভালো ছিল।' আগন্তুক আত্মীয়ের কাঁধে হাত দিয়ে শ্রীভূষণবাবু শোক সুরু করলেন।

ততক্ষণে, সেই কালি-পড়া ফাটা-চিমনির হ্যারিকেনে পা থেকে চোখ তুলে বারিধি দেখলো আরেকবার সেবাকে। মুহূর্তে মনে হল ঢেঁশকেলে মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছে। যাকে বলে বপুষ্টমা, অনল্পযৌবনা। যেমন বাঁধুনি তেমনি বলনি। অপ্রাপনীয়া হলেও যেন অবারণীয়া নয়।

গঙ্গা ত্রিপথগা। স্বর্গবাসিনী মন্দাকিনী, মর্তপ্রবাহিনী ভাগীরথী আর পাতালগামিনী ভোগবতী। বারিধির মনে হল যে যেন পাতাল কত দূরে তাই দেখছে এই অন্ধকারে।

ওৎ পাতল না, বুক পেতে দিল। হরেন সরে দাঁড়াল এক পাশে, মামুলি তদবির করতে এসেছিল, দেখল আসল আমমোক্তারনামা বারিধির হেপাজতে। মিলিতহস্ত চাকর জোগাড় হল নিমিষে। ঝুড়ি করে কয়লা এল, বোতলে কেরোসিন, কাটা-বালতির তোলা উনুনে চাপানো হল রান্না। লক্ষ্মীকাজল চাল, ডাল সোনামুগ। তা থেকে তুলে আনা ডিম। বোঁটা-ছেঁড়া বেগুন। দানা-ওলা ঘি। শুধু খাইয়েই বারিধি নিশ্চিন্ত নয়। এল তক্তপোষ, মশারি খাটাবার দড়ি-পেরেক, আধখানা গা ঢালবার জন্যে চটের হেলা-চেয়ার। নর্দমায় ব্লিচিং পাউডার, পাতিনেবুর ঝাড়ের ধারে-পারে কার্বলিক এসিড। রাত্রে সাপ বলতে নেই—লতা ওঠে বেয়ে-বেয়ে। নগদ টাকা গেছে, গয়না ক' গাছা না যায়। সিঁধেল চোর আছে আনাচে-কানাচে। আছে ছিঁচকে চোর। দড়িতে টাঙানো কাপড়, আলগা বাসন বা পাইখানার গাড়ু ধরে যে টান মারে। হুঁস রাখতে হবে চোখে-কানে। তা ভয় নেই কিছু। গ্রামরক্ষাসমিতির একজন স্বেচ্ছাসেবী না-হয় রাখবে সে পাহারায়।

তূণ থেকে আরো ঝকঝকে বাণ সে বার করল। মায়াময়ীকে ডাকল

মা, সেবাকে দিদি, শ্রীভূষণবাবুকে রায়মশাই। ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে দেখতে-দেখতে লক্ষ্মণ থেকে হনুমান বানিয়ে ফেললে।

মেয়েরা গলে গেলেন। কৃতজ্ঞতায় শ্রীভূষণবাবুর গলা খাটো ও চোখ ঝাপসা হয়ে এল। চলে গেলে জিগগেস করলেন হরেনকে, 'এ কে হরেন?'

হরেন চোখ গোল করে বললে, 'মস্ত লোক।'

'তা চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। স্বভাব দেখে। কে এ?'

'এ পরগনার মালিক জমিদার পয়োধিনাথের ছেলে।'

'বলো কি?' শ্রীভূষণবাবু সপরিবারে চমকে উঠলেন, 'এত পরোপকারী।'

'রাত-দিন এই করছেন। দেশের কাজ। কার কি অভাব-অভিযোগ তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন। জমিদারিতে রুচি নেই। বাপের সঙ্গে হচ্ছে না তাই বনিবনা। চাষী মজুরের ঘরে না জন্মে কেন জমিদারের ঘরে জন্মালেন এই শুধু তাঁর আপশোষ।'

দরজার মাপের হাতির দাঁত-সাজানো বৈঠকখানায় মখমলের ফরাসে রঙচঙে মাদুরের তাকিয়ায় ঠেস-দেয়া জমিদারি তার কাছে বিষের পুঁটুলি। জমি যার, জমিদার—এই নতুন রসায়নে সে শোধন করে নিয়েছে নিজেকে। লাঙল যার, তারই ভাগে সীতা, শস্যমালিনী ধরিত্রী। তারই ভাগ্যে অস্বতন্ত্র স্বত্ব।

অন্তহীন দিগন্তের স্বপ্ন দেখে বারিধি, আইলহীন মাঠের। নিষ্কণ্টক, অসপত্ন পৃথিবীর। শুধু স্বপ্ন দেখে না কাজ করে। খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায় গ্রামের হালটে। কার কি জমি খোঁজ করে, নোনা না মিঠে, আওল না নাবাল। নোনা শিকস্তি হয়ে কার মাঠে অজন্মা হচ্ছে, জলচাপ হয়ে কার ফসল যাচ্ছে মারা, কার ধান খেয়ে যাচ্ছে ধামসা পোকায়, সে তার তল্লাস-তদারক করে। খাজনা মকুব করার হুকুম

জারি করে। বাঁধবন্দী ও জলনিকাশের ব্যবস্থা করে। বাঁকি-পড়া জমি বাঁচিয়ে দেয় নিলামের মুখ থেকে। যে ধার খায় তার ভার কমায়। সুদ-জাত্ বন্ধক উদ্ধার করে জমি দেয় ফিরিয়ে। মাটি-কাটাই, মাটি-ভরাট বা মাটি-পেটাইর যে কাজ করে, যে কাজ করে ছিটে-বেড়া বা চটা-বাখারির, তাদের জনের দাম বাড়ায়। সরাসর রাস্তা আটকে চাষীদের গতি-মুক্তির পথ কে বন্ধ করেছে, তার মুখ খোলসা করে। জঙ্গল হাসিল করে। জঙ্গল উঠিত হলে প্রজা বসায়। চাষের সময় কারা আল-ঠেলাঠেলি করছে, কোথায় বাধছে হুড-ঝগড়া সব সে নিষ্পত্তি করে। হাটে যায়, জেলো হাঁড়ির হাট, মাদুরের হাট, গরুর হাট। তোলা কমায়। আঁদাড়-পাঁদাড় থেকে বেশ্যা তাড়ায়। আমলা-ফয়লার খাঁই কমায়। গরু রোগা হয়ে যাচ্ছে, আবাদের শামলা ঘাসের বদলে খোল-ভুষির ব্যবস্থা করে। মেরামত করে দেয় কার নাড়াকুচির ঘর। হিন্দু-মুসলমানে মিল-মহব্বত করায়, মিলে-জুলে থাকতে শেখায়। গ্রাম্য মুরুব্বি-মাতব্বরের খপ্পরের বাইরে চাষাভুষোদের এককাট্টা করে। গড়ে কৃষকসমিতি।

'মফস্বলে এসেছেন, দেখুন এবারে সত্যিকারের বাঙলা দেশ। দেখুন ঘুরে-ঘুরে।'

'শুধু দেখলেই কি হবে?' সেবা চোখ টান করে বললে।

'না, কাজ করবেন। ভাঙবেন, গড়বেন। নতুন ছাঁচে ঢালাই করবেন সংসারকে। কত কাজ মেয়েদের।'

'দিন না কিছু কাজ।'

দূরে থেকেও অনেক কাছে তারা এসে গেছে।

না এসে উপায় কি। সময়টাই বাঁকা, বেয়াড়া। সমস্তই বেবন্দেজ। রাজধানী থেকে মেয়েরা এসে পড়েছে গ্রামে, দেশান্তরী পাখির মত।

এসে পড়েছে অনিষেধ আকাশের নিচে। ঝাঁক বেঁধে। শাড়িতে ঝলস ও গয়নাতে ঝলক দিয়ে বেকাহুন ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেলে-মাটির শাদা বাঁধের উপর দিয়ে, উড়ি-ঘাস-গজানো নাবাল চরে, ইস্টিশান পেরিয়ে পায়ে-পায়ে দাগ-ফেলা মেঠো রাস্তায়। গেঁয়ো শহরের লোকেরা হাঁ করে চেয়ে থাকে, মাথায়-বোঝা-চাপানো হাটুরে বেপারিরা ঘাড় ঘোরায়, আড়তদারের হাতের পাল্লা বেপালট হয়ে যায়, মুহুরিদের হাতের কলম কানে গিয়ে ওঠে। বউ-ঝিরা ইতি-উতি উঁকি-ঝুঁকি মারে। যারা নেহাৎ হেঁজিপেঁজি নয়, যারা ভদ্রলোক, তারা আড়বাঁকা হয়ে চাউনিটা একটু কোণাচে করে। লীলায় লালিত চিত্রিতা হরিণীরা যেন নেমে এসেছে কোন দুরারোহ পর্বত থেকে। কারু বেণী কারু লোটন, কেউ বা আঁট দিয়ে গেরো বাঁধা। গাছের ছায়ায় পিকনিক করে, নৌকো নেই বলে ছই-হীন গরুর গাড়িতে বসে খোলা গলায় গান ধরে। কেনই বা ধরবে না শুনি? সবাই বেঁচে এসেছে উদ্যত মৃত্যু, নির্ধারিত অপমান থেকে। ছাড়া পেয়েছে অবকাশের আবহাওয়ায়। প্রৌঢ়ারা পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে, স্যাণ্ডেল পায়ে, লম্বা আঁচলে চাবির রিঙ বেঁধে, কেউ বা খাটো আঁচলে গাঁথুনি আঁটুনি করে। বেরিয়ে পড়েছে পাড়া বেড়াতে, তাদের শহুরে স্পর্ধা ও সমৃদ্ধি দেখাতে। যার যত কাপড় তার তত শীত তাই প্রমাণ করতে। নয়দুয়ারীর মত এ কোন নরকে এসে পড়েছে তারই জলন্ত অস্বস্তি মুখে মেখে। স্কুল-কলেজ-পালানো নিষ্কর্মা ছেলের দল ফক্কুড়ি করে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, পাটের গুদাম কেটে যেখানে সিনেমা বসানো হয়েছে সেখানে গিয়ে হল্লা বাধায়। নদীর পারে, যেখানে বা উড়ন্ত আঁচলে মেয়েদের জটলা। কাবলি পায়ে, বুকের বোতাম-খোলা শার্টে, উস্ক-খুস্ক চুলে রাশ-হালকা হয়ে রাশিয়া-রাশিয়া করে—সমস্ত ধনী নিঃস্ব হয়ে যাবে ভেবে মনে-মনে গরমের আরাম পায়। কোথায় কে যায় কখন কে বাড়ি ফেরে, কোনো দিশ-পাশ নেই।

অভিভাবকেরা শুধু বাজার করে। শহরের আর-কাউকে কিছু কেনবার ফুরসৎ দেয় না, খারা ভরে মাছ আর ধামা ভরে তরকারি নিয়ে আসে। উপর-চড়া হয়ে দাম বাড়ায়। শুধু তাই নয়, মজুদ করে চাল আর চিনি, কয়লা আর কেরাসিন, মজুদ করে মজা মারে। গাছেরও খায়, তলারও কুড়ায়। ধান ভানতে হয় না, তৈয়ার অন্ন খায়, ভাবনা কি, এমনি ভাব নিয়ে ছেঁড়া ধুতিতে লম্বা কোঁচা দুলিয়ে চলে। পাশের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের পুঁজির খোঁজ নেয়, বেহিসেবী প্রতিযোগিতা চালায়। তারপরে যখন খবরের কাগজ আসে, দশ দিক হতে দশ মাথা একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে। লিখিত-র মধ্যে অনুল্লিখিতের ব্যাখ্যা করে, বসে-বসে গুজবের গাঁজা টেপে। নিজেদের পালানোর সমর্থন হিসেবে অঘটনের রটনা করে। সমস্ত কিছুই যেন ফেরফার, উল্টা-পাল্টা হয়ে গেছে এমনি ভাবের থেকে নিজের সংসারেও শৃংখলা রাখে না।

যার-যেমন-খুসি, যখন-যা-ইচ্ছে। সমস্ত কিছুই অস্থায়ী, অব্যবস্থ। এখন-তখন।

গেঁয়ো শহর হকচকিয়ে গেছে। মেয়েরা সাইকেল শিখছে, ছেলেরা নেশা করছে, ছেলেতে-মেয়েতে মিলে স্যাঙাত পাতাচ্ছে। এদিকে জিনিস-পত্রের বেদম দাম, বাজারে রেজকি নেই, পয়সা হঠাৎ পাখনা মেলে উড়ে পালিয়েছে, পাকির ওজন নেমে এসেছে কাঁচির ওজনে। শুধু উসখুসিয়ে উঠেছে চোর-বাটপাড়ের দল, গুণ্ডা-বদমাস। কেউ বা গয়নার গরম দেখে, গয়নার গরব দেখে কেউ বা। কেলেংকারি যেখানে যেটুকু বাধছে, চাপাচুপি দিয়ে রাখছে। নিজের ঝাল নিজের গালেই রেখে দিচ্ছে। গোঁজামিল, জোড়াতালির দিন এখন।

শ্রীভূষণবাবু তবু মাঝে-মাঝে তিড়বিড় করে ওঠেন। বলেন, 'সেবার অত মেশামিশিটা ভালো নয়। একটু সামলাতে বলো।'

মানে, নিজে বলতে জোর পাচ্ছেন না। এ তো আর অকেজো

ইস্কুল-মাস্টার নয় যে মেজাজ তিরিক্ষি করবেন। বারিধির মত ছেলে! তিনি তো জানেন সে কি করেছে তাঁদের জন্যে। নিতান্ত অমর্যাদা দেখানো হয় বলেই শুধু নগদ টাকা নেয়নি, কিন্তু যা সে দিয়েছে তা নগদ টাকায় কেনা যায় না। এই আতান্তরে বিদেশে-বিভুঁয়ে এসে তার কাছে তাঁরা যে উপকার পাচ্ছেন, যে আনুকূল্য, তার মাপজোখ নেই, অথচ কোথাও এতটুকু অনুকম্পার খোঁচা লাগে না। তাঁরা আতুর আর সে দাতা একটুকু তার উল্লেখও রাখেনি কোনোখানে। বরং সে দায়ী আর তাঁরা অধিকারী এমনি নম্র-নির্মল ব্যবহার। শ্রীভূষণবাবু যে এত খুঁতখুঁতে তবু স্পষ্ট করে আঁচড় কাটার জায়গা পান না।

তবু, যুক্তি-তর্কের বাইরে, মনটা কেমন খচখচ করে। বেখাপ, বেমানান লাগে। রিটায়ার্ড রেলকর্মচারীর মেয়ে আর জমিদারের ছেলে জলের বিম্ব হয়ে জলে মিশে যাচ্ছে না, তেলে জলে হয়ে যাচ্ছে।

'রাখো তোমার বাজে কথা।' মায়াময়ী ঝাঁজিয়ে ওঠেন। উঠতে পারেন কেননা আবহাওয়াটাই এলোমেলো। বলেন, 'মেয়েটাকে পড়ালে না, বিয়ে দেওয়ালে না, এখন এই একটু দেশের কাজ করছে এতে আবার বাদ সাধতে এসেছ? তবে কি ও পড়ে-পড়ে ঘুমোবে আর মোটা হবে?'

দেশের কাজ। বারিধির এ এক রকমের বিলাসিতা। জানেন তা শ্রীভূষণবাবু। এ এক রকম নামের মাতলামো। জমিদারের ছেলে হয়ে কমিদর-দের সঙ্গে মিশছে এ এক রকমের বাহাদুরি। নিজে না খেলে পাশে বসে 'বল' চালাবে, এ উপর-চাল ছাড়া কিছু নয়। বাপের হস্তবুদে খাঁকতি পড়ে এ কখনো চায়না বারিধি। চায়না, সে ভোলে যে সে অসাধারণ কিছু করছে, তার এই নেমে-আসায়ও সেই আভিজাত্যের চেতনা। সম্ভ্রান্ততার স্বাদ। খালি-পায়ের ধুলো মুছে মাঝে-মাঝে সে রাজবেশ পরে—আন্তঃপ্রাদেশিক পোষাক—মাথায় কাপড়ের টুপি, পায়ে আলখাল্লার ধরনে পাঞ্জাবি, পরনে পা-জামা, পায়ের চটিটা মুখ-ঝুলটানো।

যখন সে বক্তৃতা করে, যখন সে গরিবের দাবি নিয়ে দাঁড়ায় গিয়ে বন্ধ দরজার কাছে। তখনই কিছুটা আশ্বস্ত হন শ্রীভূষণবাবু। তার ঐ ঢিলেঢালামিতে পরিচিত পারিমিতি খুঁজে পান। খুঁজে পান আলস্যের আভাস, আরামের গন্ধ। আশ্বস্ত হন, যখন দেখেন তার স্বাস্থ্য বলোদ্ধত, ভাষা মার্জিত, ভঙ্গি সম্মত-সঙ্গত। যখন দেখেন শিক্ষা-সহবৎ কিছুই সে ছাড়েনি, ছাড়েনি তার কৌলীন্যের, ধনবত্তার দায়িত্ব। শুধু কিছু বা টাকা খরচ করছে। ভাতুরে-কুঁড়ে আর-আর জমিদারের ছেলের মত মামুলি নেশায় টাকা না উড়িয়ে নতুন নেশায়, দেশের নেশায়, মজা উড়োচ্ছে। সমান তামসিকতা। ফলে যদি একটা সে রায়সাহেব পায় বা একটা বিলিতি কাঁসার মেডেল, তাতেই সে হয়তো চরম খুসি হয়ে গিয়ে খোলে মুখ ঢোকাবে।

মনে-মনে যাই বলুন, মুখে বলতে পারেন না। যেটুকু সে করছে তাই বা সত্যি কম কি। তাতে শ্রীভূষণবাবুর আপত্তি নেই। যেখানে তাঁর বাধছে, সে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা নিতান্তই সাময়িক বলে, আকস্মিক বলে, ভঙ্গিটা বেমজবুত বলে। পিছনে কোনো দুঃখবোধ নেই বলে। দেশের জন্যে দুঃখ না পেলে দেশের জন্যে প্রীতি হবে কেমন করে। তাই তাঁর মনে হয় এও আরেক রকমের ভাবতারল্য, হৃদ্বারণ। ভক্তের ভণ্ডামিটা ভক্তি-জিনিসটাকেই তেতো করে ছাড়ে।

কিন্তু তাঁর আপত্তিটা আসলে কোনখানে? বেশ তো, বারিধি যদি শেষ পর্যন্ত পুকুরে এসেই ক্ষান্ত হয়, মন্দ কি। জমা-ওয়াশিল-বাকি, কড়চা-সেহা, রোকড-চালান, চিঠা-খতেন। সে তো সুখের কথা। শাখা-প্রশাখা যতই তার ছাঁটকাট যাক, কাণ্ড তার প্রকাণ্ডই থাকবে। তবে এমন লোক হাতে পেয়ে সোনা ফেলে কে আঁচলে গেরো দেবে? ঘর থাকতে বাবুই ভিজুক, কিন্তু মায়াময়ী নয়। এখানে যে ছোকরা এস-ডি-ও এসেছে তার বিয়েটা কি করে ঘটল জান? দিনের বেলায়ও

লণ্ঠন জ্বেলে খুঁজতে হয় এমন কালো বউ, কিন্তু গায়ের কালো চোখের নজরকে কালো করতে পারে নি। মেয়েটার বাপ-মা তো গছিয়ে দিতে পারত না, তাই গুছিয়ে দিয়েছে। ফাঁদ পেতে কাঁধে তুলে দিয়েছে। দেখতে-দেখতেই শেষে ভালো লেগে যায়, মাটির কলসীও শানে ক্ষয় ধরায়। এত উড়ো মেয়ে থাকতে বারিধি যখন এদিকে হেলেছে তখন হেলা করে হাল ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? বাতাস পেয়ে পাল না তুলে দেবার মত ঝকমারি আর কি হতে পারে ?

যেমন দিন পড়েছে।

৪

রদ-বদলের দিন। নির্মূল করে নতুন নির্মিতি। নতুন মূল্যীকরণ। উদ্দণ্ড 'না' এই বারিধি। নির্মম নাস্তিবাদী। ধরো, ঈশ্বর। কি এই ঈশ্বর? ধনতান্ত্রিক সমাজে নির্ধনের জন্যে স্তোক, শস্তায় সান্ত্বনার ব্যবস্থা। দগ্ধ যন্ত্রণার উপরে মৃদু হস্তপ্রলেপ। যাতে সৌভাগ্যবান তার বিত্ত-বেসাত সম্ভোগ করতে পারে স্বচ্ছন্দে। অথচ এই ঈশ্বরের নামে কত খুনোখুনি, কত রক্তারক্তি। নিজেকেও ভুলি, পরকেও ভুল করে দেখি। যে-ঈশ্বরের সবাইকে সমান করার কথা, সে-ঈশ্বর এখন বাদ পড়লেই সবাই সমান হতে পারে। কিসের তোমার কর্মফল? তুমি যে গরিব হয়ে জন্মেছ সে কি তোমার দোষ, না সমাজের অপরাধ? যদি আজ দেশ থেকে দারিদ্র্য ঘুচে যায়, তবে কোথায় যাবে তোমার পূর্বজন্ম? আমাদের সমস্ত কর্মজাল জটিল করে রেখেছি হাতের রেখায়, বর্তমানের নিষ্ক্রিয়তাকে রঙিন করে রেখেছি ভবিষ্যতের সম্ভাবনায়। এও এক ফন্দি, যাতে না আমরা কাজ করি, ভিড় বাড়াই, দাবিদার হই। চোখে যাতে না জ্বালা ধরে তারি জন্যে চোখে আমাদের পরকালের পরকলা পারিয়ে দিয়েছে। যা দৃষ্ট যাতে তা না দেখি তারি জন্যে অদৃষ্টের ধোঁকা তৈরি করে রেখেছে। ঝলসা-কাণার মত হয়ে আছি। না, ইহকাল ছাড়া কিছু নেই, কিছু নেই মানুষের উপরে, মানুষের বাইরে। মোহ-মুদ্গরের জন্যে চাই এখন নতুন মোহমুষল। চাই নতুন পরশুরাম। মাতার মত যে সনাতনী তাকে পর্যন্ত যে উচ্ছেদ করেছে। শিউরে উঠলে চলবে না। সনাতন বলেই কিছু সত্য নয়। আলস্য-অভ্যাসে মিথ্যেও

সত্যের চেহারা নিয়ে দেখা দেয়। শূন্য জ্যোতির্লোকের দিকে ঊর্ধ্বগ্রীব হয়ে নিরালম্বের মত আশ্রয় খুঁজি, পায়ের নিচের দৃঢ়, শক্ত মাটিকে অস্বীকার করি। না, চোখ আনতে হবে ফিরিয়ে, নিজের দিকে, পরিপার্শ্ব, পথিপার্শ্বের দিকে। গোলকধাঁধা থেকে আসতে হবে বেরিয়ে, ফন্দিবাজদের বহুকেলে প্রবঞ্চনা ছিঁড়েফুঁড়ে ফেলতে হবে।

না, না, না। বারিধির মন্ত্রপাঠ শেষ হয়নি এখনো। কাকে তুমি মহৎ গুণ বল? দয়া, দক্ষিণতা? আমি আরামে থেকে তোমার দুঃখে আহা-উহু করছি, এ কি একটা গুণ? এ ভেঁপোমি ছাড়া কিছু নয়। আমার অতিরিক্ত আছে, আর তুমি নিঃস্ব, তাই আমার দান ও দয়ার এত মহিমা। কিন্তু যখন তোমারো থাকবে, তখন আমি কাকে দান করব? কোথায় দয়া যাবে গয়া হয়ে। আমি অন্যায়রূপে অজস্র সঞ্চয় করেছি, আর তুমি দিন এনে দিন খেতে পাচ্ছ না, জরার দুয়ারে এসে একদিন তা ত্যাগ করে দিলাম, ততদিন দণ্ডিত না হয়ে আজ আমার সংবর্ধনা হল। কোথায় থাকবে ত্যাগের বড়মানুষী, যখন আমার অপ্রয়োজন তোমার প্রয়োজনকে শূন্য, শুষ্ক করে রাখবে না? কিসের কি কৃতজ্ঞতা? যেখানে দানের স্থান নেই, সেখানে কৃতজ্ঞতা কপটতা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের চোখে ওরা মায়া-কাজল পরিয়ে রেখেছে, যাতে রোগের ঘোর আমাদের না কাটে। সেবা—তুমি নও—শুশ্রূষা, পরিচর্যা—সেবা বলতে লোকে যে এত অজ্ঞান, এটার মাঝে আছে কি? আবেগে বয়ে যেয়ো না, ভেবে দেখ। যখন সমাজ-ব্যবস্থার দরুণ রোগের প্রসার বা প্রাদুর্ভাব যাবে কমে, যখন দেশে বন্যা হবে না, হবে না দুর্ভিক্ষ, মড়ক এসে সড়ক বানাতে পারবে না, তখন কোথায় যাবে তোমার সন্নেসীরা তাদের সেবাধর্ম নিয়ে? যখন প্রতি মাইলে একটা করে হাঁসপাতাল বসবে আর রুগী পিছু একজন নর্স, তখন তোমার সন্নেসীদের মঠ ছেড়ে ফ্যাক্টরিতে গিয়ে ভর্তি হতে হবে, সেই মঠই হবে

হয়তো হাঁসপাতাল। এখন সন্ন্যেসী দেখে যেখানে ভাবে বিভোর হচ্ছ, সেখানে সন্ন্যেসী দেখে তখন লজ্জিত হবে। আর অপচিত মনুষ্যত্বের প্রতীক সেই সন্ন্যেসী তখন বা তুমি দেখবে কি করে? সংসার যারা পরিহার করতে চায়, তারা জেলে, সেবা ফুরুলেই যাদের কাজ ফুরোয় তারা কারখানায়। রঙ তখন গেরুয়া নয়, লাল। যদি লালসার মত লাল বলতে না চাও, বলো সূর্য ওঠার মত। ফুটেছে অনেক শাদা ফুল, এবার লাল ফুল ফোটাও। জানি তুমি এর পর সতীত্বের কথা তুলবে। সতীত্ব হচ্ছে পুঁজিবাদের উত্তরফল। সিন্দুকে গচ্ছিত সোনা, অন্তঃপুরে আবদ্ধ স্ত্রী। স্ত্রীত্ব হচ্ছে বিজ্ঞাপনের ফলক আর সতীত্ব হচ্ছে তার উজ্জ্বল বর্ণমালা। ফ্যাসিজমের নির্দয় নিদর্শন। স্বামীত্বের, প্রভুত্বের ফ্যাসিজম।

'কিন্তু বিয়ে?' সেবা ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করে।

ওটা বৈজ্ঞানিক, ওটাকে মানতে হবে। কিন্তু এ-জাতীয় বিয়ে নয় প্রেম বা প্রয়োজনের থেকে নয়, সমকর্মিতার থেকে। যে সহকর্মিণী না হবে সে সহধর্মিণী হবে কি করে? প্রেমের থেকে যে বিয়ে সে শুধু প্রেমটাকে অপ্রমাণ করবার জন্যে, প্রয়োজনের থেকে যদি বিয়ে করি তবে আমি কৃতদার নই, কৃতদাস। কি করে পারস্পরিক আকর্ষণ রাখব বাঁচিয়ে যদি না কর্মে সমতা আসে, কর্মে না মুক্তি পাই? প্রথম রাত্রের শিশিরেই তো প্রেমের পালিশ যায় ধুয়ে, তখন কে বাঁচাবে সেই মোহমোচন থেকে? নর্ম নয়, কর্ম, বলতে পারো বা কর্মের সাধর্ম্য। আমি-তুমি যদি হাত মেলাই, সে-হাত ঘর্মাক্ত হবে, কর্মাক্ত হবে, ক্লিন্ন, কিণ-কঠিন হবে। আমি কেরানি, আর তুমি কেরানির রানি হয়ে থাকবে ঘুঁটেকুড়ানির চেহারায়, তা আর চলবে না। হাত থেকে হাত যদি যায় খসে, তোমার কর্মের সেই মহান অধিকার বাতিল হয়ে যাবে না, পাবে নতুনতর স্বীকৃতি, নতুনতর সাহচর্য।

অনেক টালমাটালের পর সেবা যেন শক্ত আশ্রয় পায়। তীব্রতার

মাঝে পায় একটা স্পষ্টতার শান্তি। ঘোরাঘুরি না করে স্থির লক্ষ্যে চলে আসবার দ্রুততা তাকে চমক লাগায়, পরাভূত করে। সুজনকে মনে হয় অনেক ফিকে, অনেক ভীরু। মনটা নির্জীব হয়ে পড়ে ছিল, হঠাৎ রুখে ওঠে। ২ বলে ওঠে, অক্ষম, অযোগ্য, অসভ্য।

হ্যাঁ, এসেছে দিন-বদলের দিন। হাওয়া-বদলের হাওয়া। আজকের সুজন কালকেরও স্বজন হয়ে থাকবে এমন কোনো কথা নেই। সময় তার খোলস বদলাচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মন। ছাঁচ বদলালেই ছাঁদ বদলাবে। ভাষা যাচ্ছে বদ্‌লে—যে-শব্দ যত বেশি গ্রাম্য তা তত বেশি সংস্কৃত, হরফ, বানান, ব্যাকরণ সব যাচ্ছে ওলোটপালোট হয়ে। চলেছে সব সহজ-সরলের পথে। বদলাচ্ছে ব্যবহার। বদলাচ্ছে মর্যাদার সংজ্ঞা। বেবনেদ মধ্যবিত্ততা ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। বলছ কি, দেশের আইন আজ এমুখো। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, চাষী-খাতক আইন, মহাজনী আইন। এসে গেছে ফিরিয়ে দেবার দিন। মহাজনদের চেঁছে-ছুলে দিচ্ছে চাষীরা, উৎখাত জমি নিয়ে আসছে ফের খাসদখলে। আসল হক-হকিয়ত যে তার, পাচ্ছে তার স্বীকৃতি। ঠেকাবে কি করে? যায় যদি, যেতে দাও এই হাজাশুখার দিন।

আমাকে বলে, আমি জমিদারের ছেলে, গরিব নিয়ে বাবুয়ানা করছি। আমার জন্মের সেই কলঙ্ক আমি মুছব কি করে, আমার রক্তের নীলাভা? ভেক ধরেও আসল বৈষ্ণব হওয়া যায় সংসারে। আর এ যদি নিতান্ত খোস-খেয়ালই হয়, ক্ষতি কি? বলব, নির্দোষ খোস-খেয়াল। অন্তত নেশা-ভাঙ করার চেয়ে ভালো। একজনকেও যদি দিতে পারি একটু শিক্ষা, ঘোচাতে যদি পারি একজনেরও দারিদ্র্য, আজকের দিনে তাই আমার অনেক। অনেক না হোক, কিছুটাও কি নয়? বলে, হাত দিয়ে আমি হাতি ঠেলছি। আমার যখন একার হাত, তখন হাতিটাকে বড়ই তো মনে হবে। কিন্তু তোমরা যদি এসে হাত মেলাও, তবে হাতি

কেন, বিন্ধ্যাচলও টলে পড়বে। বলে, আমার এটা সমস্তই সাময়িক, স্থায়ী নয়। বলো, দুনিয়ায় কার আছে এই স্থায়িত্বের অহংকার? চিরস্থায়ী যে বন্দোবস্ত তাও রদ হয়ে যাবে বলে শোনা যাচ্ছে। এই যে ধর্ম আর ধন নিয়ে এতদিন ধাপ্পাবাজি চলেছিল পারল তা টিঁকে থাকতে? সময় যদি সদয় হয়, তবে কি সাময়িক হব না? জীবনে আমার দুঃখানুভব নেই, তাই সমস্ত জিনিসটাই আমার কৃত্রিম, এ নালিশও তুমি শুনে থাকবে। না খেতে পাওয়ার দুঃখের অবিশ্যি তুলনা নেই, কিন্তু কিছু করেও কিছুই করতে না পারার দুঃখটাই কি কম? আমি জেলে যাই নি তা ঠিক, যেতেও চাই নে, জীবন আমার কাটেনি দারিদ্র্যের পেষণে, তাতে আমার নির্বাচন ছিল না, কিন্তু বলো, তাই বলে কি আমি নামঞ্জুর হয়ে যাব? আমি যে আমি হতে পারছি না সেটাই কি যথেষ্ট যন্ত্রণা নয়? আর, কোথায় আমার হিংসা, যত দেখতে পাই ঘাস, তত দেখি দলিত কাঙালের দল, উপরতলার দিকে তো চোখই ফেরাই না। যদি বা দেখি করুণার চোখে দেখি। ইজারা নিয়ে দখল পেয়ে যদি বা কেউ মূলস্বত্বের দাবি করে আর যদি তুমি অধিকার সাব্যস্তের জন্যে মামলা করো, তাতে হিংসা কোথায়? বরং তোমার কৃপা হয়, ওর নির্ঘাৎ হার জেনে। ওর মিথ্যে হায়রানি দেখে।

যে যাই বলুক, তুমি ভুল বুঝো না।

সেবার মন মোমের মত গলে-গলে পড়ে, শিখাটা আরো কেঁপে-কেঁপে ওঠে। বলবান যখন বিষণ্ণ হয় তখন তাকে আরো মূল্য দিতে ইচ্ছে করে। বক্তৃতার দীপ্তির চেয়ে এই বিষাদ-বোধের স্নিগ্ধতাতেই সেবা বেশি নরম, নিস্তেজ হয়ে আসে।

যাক যা কিছু নড়বড়ে, যা কিছু পচা-গলা। যা কিছু খাস্ত, বরবাদ বরখাস্ত করে দাও। থাক শুধু শ্রম আর সাম্য আর সখ্য।

৫

এখন আমন ধান কাটা হয়ে গেছে। নাড়া দিয়ে বিড়েয় বেঁধে ধান নিয়ে এসেছে চাষারা। নিয়ে এসেছে বাড়ির খলটের খামারে। ছাই আর মাটি দিয়ে তৈরি যে-খামার। চ্যাটার উপর বিছিয়ে শুকোতে দিয়েছে রোদ্দুরে। তাই দেখতে চলে আসে দু'জন, সেবা আর বারিধি। দু'তিন রোদ্দুর লাগবে নাকি শুকোতে। দাঁতে ভেঙে বুঝবে তৈরি হয়েছে কিনা। কোন-কোন বাড়িতে মেটেতে ভিজিয়ে সেদ্ধ বসিয়েছে এরি মধ্যে। ধান ফেটে গেছে দেখলেই বুঝতে হবে নামাবার সময় হল। গরম ধান ঠাণ্ডা করে আবার চ্যাটায় ফেলে রোদে দাও। পা দিয়ে নাড়ো-চাড়ো, ওলটাও-পালটাও। অন্তত দু'দিন ফের লাগবে হয়তো শুকোতে। তারপর নিয়ে যাবে ঢেঁশকেলে, বসে আছে ধান-ভানুনীরা।

পইয়ের উপর বাবলা-কাঠের ঢেঁকি বসানো। আড়া ধরে ঢেঁকির পাটিতে পা রেখে পাড় দেবে হয়তো দু'জন, আরেকজন নোটে হাত ঢুকিয়ে ধান এলে দেবে। ছেকাঠ যেন হাতের উপর এসে না পড়ে ততটুকু তাল রেখে চলতে হবে। নইলে শেষে তাল আর সামলানো যাবে না। আধছাড়া হয়ে গেলে ধান ঝাড়বে কুলোয় করে। ঝেড়ে ফের নোটে দেবে। সম্পূর্ণ ছেড়ে গেলে ফের তুলে নেবে কুলোয়। গায়ের কুঁড়ো পরিষ্কার করবার জন্যে আবার একবার কুটতে হবে। তারপর শেষবার ঝেড়ে নিয়ে মজুত হল গিয়ে মটকাতে। শেষবারে চাল কাঁড়িয়ে খুদ বেরুবে, সেদ্ধ করে খাওয়াও গরুকে। কে তোমরা ধান-ভানুনীরা? আমরা বাবু মুচি-কেওড়া। মজুরি খাটছি। এক মণে চার আনা মজুরি।

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে সব সেবা। শোনে আর শেখে। গরুকে খোল-বিচলি খেতে দেয়া হয়েছে। গরু দিয়ে মলে যা বাকি থাকে তারই নাম পল। খেতে যা ফেলে এসেছে সেটা নাড়া। আর হাত দিয়ে ঝাড়া ধানের গোড়ার নাম বিচলি। ছোটনা ধানের বিচলিই হচ্ছে গরুর ভাল খাওয়া। চন্দনকাঠ বেটে' দিতে পারো যদি জাবনার সঙ্গে মিশিয়ে, তবে আর দেখতে হবে না, এক বলকেই দুধে দু' আঙুল মোটা সর পড়বে। গরুও উঠবে তেজী হয়ে। ও যদি না পার, ফাতশুদ্ধ ফেন দাও, দাও কুঁড়ো আর চুনো। আর ঐ দেখ কেমন পলের গাদা দিয়েছে। মাচায় করে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে কেমন গাদার ছাউনি তুলেছে। ঠিক সোনালি গম্বুজের মত। এটা বুঝি গোলপাতার ঘর। কি রকম এ গোলগাছ? নারকোল গাছের চারার মত দেখতে, দশ-বারো হাত উঁচু। হয় নানা দেশে, জঙ্গলের মত হয়। পেলে কি করে? বিলি-বন্দোবস্ত হয় নাকি? না, চুরি করে নিয়ে এসেছে, কাটবার ছাড় নেই। জালি-বোটে বন-বাবুরা পাহারা দেয়। তারি এক ফাঁকে ডোবা নৌকো তুলে কেটে নিয়ে এসেছে। নাড়া বেচবে, না, তা দিয়ে ঘর ছাইবে?

এই বুঝি সব যন্ত্রপাতি। যুদ্ধে কত অস্ত্র লাগছে, কিন্তু লাঙলের মত অস্ত্র কই? এ হনন করে না, খনন করে, উদ্ঘাতিনী ভূমিকে সমতল করে, ধরিত্রীকে করে শস্যমালিনী। বাঁকা কাঠটার নাম বুঝি গাদা, আর গাদার মুখে ফাল, আর এই লম্বা কাঠটার নাম ইশ। ফালের উলটো দিকের কাঠের নাম মুঠে। কাঠের খিলটার নাম আটচাল। আর একে বলে মই বা পেটে, কেউ বা বলে বাঁশুই। এটার নাম বিদে, লোহার কাঁটার চিরুনি। আউসের চারা গজাবার পর বিদে দিয়ে, আঁচড়ে দেয় মাটি। আর একে বলে নিড়েন, ধান-গাছ রেখে আগাছা-ঘাস মেরে দিতে হয় একে দিয়ে। আছে কোদাল আর গাঁতি, খুরপি আর

খন্তা। বড় শ্রদ্ধেয় এ সব কৃষিযন্ত্র। শত ধার খেলেও এদের ক্রোক করতে পারো না তুমি।

আজ তারা গিয়েছিল জেলে-পাড়ায়, নিকারিদের বাড়ির পাশে। কাঁচা গাব ঢেঁকিতে কুটে ধান-সেদ্ধর হাঁড়িতে জ্বাল দিচ্ছে। শাদা, বোনা জাল বুরিয়ে রাখতে হবে সেই গাবের আঠায়। বাবলার ছালের কাথ করে উপরে লেপ দিতে হবে। কি নাম তোমার? নাম আমার শম্ভু দলুই। বুনছ কি? খেপলা জাল, যে-জাল ছুঁড়ে মারে। তুমি কি করছ? মেরামত করছি, নিকারিদের বেঁউতি জাল, যে-জাল গাঙে পেতে রাখে। টানা জাল, ঝাই জাল, ধুরকুচ জাল। বাঁ হাতে টিপনে আর ডান হাতে খরচি নিয়ে জাল বুনছে তারা। আশি সুতোয় ছয় তার দিলে তবে মজবুত হবে খুব। কিন্তু সুতো মিলছে না বাজারে। টোনা দিয়ে ঘাই বাঁধছে, আর এই ঘাইয়ে লেগেই বড় মাছ ঘায়েল হবে। এই দেখ জালের চুড়ো, ঘর বাড়িয়ে ঘের বাড়ানোকে বলে মালি দেয়া। এগুলো হচ্ছে লোহার কাঠি, জালের নূপুর। আমরা বাবু খুঁয়ে তাঁতি হয়ে তসরেতে হাত দিয়েছি। মাছের ব্যবসা ছিল আমাদের, গাঙে-গাঙে জলকর নিয়ে মাছ ধরতাম। নৌকো নিয়ে গিয়েছে, তাই এখন মাছ ছেড়ে জাল নিয়ে পড়েছি।

যেতে হবে পারঘাটায়। পাটনী মাশুল নিয়ে বড় কথাকষি করছে। বোঝা বা বাঁক নিয়ে প্রত্যেক লোকের পারানি যেখানে দু' পয়সা, সেখানে চার পয়সা নিচ্ছে। বেহারা নিয়ে খালি ডুলির ভাড়া লেখা তিন পয়সা, এক পয়সা নেই বলে ছয় পয়সা নিচ্ছে। দুই গরুর বোঝাই যদি গাড়ি হল তবে একেবারে আট আনা। ডাকের পেয়াদা, আদালতের পেয়াদা, চৌকিদার-পঞ্চায়েত তাদের গাঁটরি নিয়ে বিনে-ভাড়ায় পার হতে পারবে, অথচ দোকানি-পসারির লাগবে নিজের ভাড়া, আবার ঝাঁকা-ঝুড়ির ভাড়া। হাটের সওদা সেরে বাড়িফেরার মুখে

যাত্রীদের পোঁটলা-পুঁটলিও বাদ পড়বে না। আবার এদিকে রাস্তা মেরামত করছে যে-সব কুলি, তাদের বা তাদের হেতের-শাবলের ভাড়া মকুব, অথচ তাদের থেকেও আদায় করো, নগদান না হোক বিড়ি আর দেশলাইয়ের কাঠি। দেখ, চলবে না এ-সব জবরজুলুম। ইজারা বাতিল হয়ে গিয়ে নতুন নিলেম হবে ফেরিঘাটের। ঘাটে আলো রেখেছ কোথায়? সোয়ারিদের জন্যে এই তোমার বিশ্রামঘরের চেহারা? নৌকোয় লোড-লাইন কই? জলে ধুয়ে গেছে, না? কোথায় লটকে রেখেছ ফেরিঘাটের মাশুল-আদায়ের তপশিল? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমাকে। শুনবো না তোমার ধানাই-পানাই। না, বাবু, কান-মলা খাচ্ছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবু আর তাঁর বিবি যদি বাঁওড়ে বেড়াতে যেতে চান, সে অনায়াসে জোগাড় করে দেবে পানসি। আমাদের জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না, নিজের হুঁকোর জল ফেরাও, হাল-চাল বদলাও। যে লোক জল ভেঙে বা সাঁতার দিয়ে পার হয় তারো কি ভাড়া না দিয়ে নিস্তার নেই? না, বাবু, নাকখত্তা দিচ্ছি, আর নাকাল কোরো না। ধরলে চিঁচিঁ করে, ছেড়ে দিলেই ফের লম্ফ ঝাড়বে, বলে আরোহীর দল। ঝাড়ুক দেখি না আরেকবার, একজোট হয়ে আর্জি পাঠাবে বোর্ডের দরবারে। ভয় নেই, আমরা আছি। আমরা সে-আর্জির মুসাবিদা করে দেব।

চলো এবার এনাজ-দেনাজের বাড়িতে। দু'ভায়েতে ভীষণ ঝামেলা। বাকিপড়া এজমালি জমি নিলেম হয়ে গেছে, বেদাঁড়া তঞ্চকি নিলেম রদ করার জন্যে মামলা ঠুকেছে এনাজ খাঁ। তলে-তলে দেনাজ খাঁ গিয়ে সদরসেরেস্তার নায়েবের সঙ্গে যোগসাজস করে তাঁবাদি করে দিতে চাইছে সেই রদ-রহিতের দরখাস্ত। মতলোব হচ্ছে, নিলেম বাহাল রেখে ষোল আনা পত্তন নেবে সে একলা। এনাজ খাঁকে ভিটেছাড়া করবে। এনাজ বলে, ঘরের ঢেঁকি হয়ে কুমির হবি

তুই ? দেনাজ জবাব দেয়, নিলেম জানার তারিখ থেকে ছ'মাস কবে কাবার হয়ে গেছে, সাচ্চা কথা বলব না কেন ? এক দিকে স্নেহ অন্য দিকে সত্য, লেগেছে সংঘর্ষ। ওরা মাঝে পড়ে সালিশ করে দেয়। হাল-বকেয়া সব হিসেব-মোকাবিলা করে নাও, নিলেম খণ্ডে যাবে। তারপর দু'ভায়ে খারিজদাখিল করে জমা-জমি বাঁটোয়ারা করে নাও, কচা কিংবা জারুলের খুঁটি দিয়ে সীমানা ভাগ হয়ে যাক। মায়া-মহব্বত আবার ফিরে আসুক।

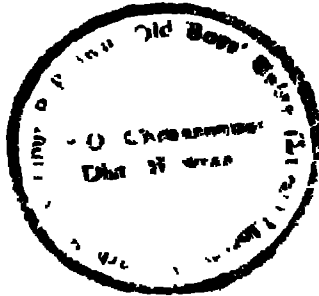
কে ওই কাঁদছে না ? হ্যাঁ, প্রিয় লাটির বউ গোরাশশী। পিটছে বুঝি বউকে। চলো দেখে আসি। কি ব্যাপার ? না, গোরাশশী রাত ভোর শিলে তার বুড়ো আঙুলের মাথা ঘসে-ঘসে ঘা করে ফেলেছে তবু প্রিয় লাটি তাকে রেহাই দিচ্ছে না, বলছে টিপের রেখা এখনো সব চুপসে যায়নি, আরো ঘসো। বুঝতে পারে এক নজরে। বউর নামে খত দিয়েছে বেনামীতে, এখন আদালতে নালিশ ঠুকে মহাজন টিপ-পরখের সাক্ষী মানতেই স্থরু করেছে এ জালসাজি। বুড়ো আঙুলের মাথাটা একেবারে বেদাগ করে ফেলছে। ধার করেছিস, কিন্তু পাপ তো করিসনি, কেন এই দেকসেক ? আসবি আমাদের কাছে। একদম মাপ করাতে না পারি, লম্বা কিস্তি করিয়ে দেব।

কেন অমন ছুটোছুটি করছিস ? তুই ভোলাই সরদার না ? কি হয়েছে ? না, পয়সা নেই। তা তো সবাই জানে। কি করে খাস ? দিন-মজুরি, ফুরনের কাজ করি। কাঠ চেলা করি, গাছ বাছি, মাটি কোপাই। তা, অমন হাঁসফাঁস করছিস কেন ? ছেলেটা বাবু মারা গেছে ভেদবমিতে। কিন্তু কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে পারছি না। পয়সা নেই দু'খানা নতুন চাদর কিনি, কিছু গোলাপপানি, আতর-কর্পূর কিনি। বাছাকে কি আমার খালি-তক্তায় শুইয়ে নিয়ে যেতে হবে কবরখোলায় ? কত পয়সা লাগবে ? পয়সা দিতে চাও দাও,

কিন্তু মরার দেহে নতুন কাপড় চড়িয়ে লাভ কি? পার এই ভেদবমির উচ্ছেদ করতে?

দেশের কাজ করছি। সেবা এই নিয়েই মাতিয়ে-তাতিয়ে রাখে নিজেকে। আর যা হোক, সামান্যকে তো মান্য করতে পারলাম, দীন-দুঃখীকে তো ভাবতে পারলাম দায়াদ বলে। সে যে দুরাকাঙ্ক্ষিনী, তাতেই কি সে দেশসেবিনী নয়?

বারিধির আশ্রয়ে নিজেকে তার অনেক নির্ভয় অনেক নিঃসংশয় মনে হয়। বেশি দৃঢ়, বেশি স্পষ্ট বলেই যেন স্থিতির মাঝে সে স্থিরতা খুঁজে পায়। এক রঙে ডুবিয়ে নিয়েছে তাদের নিশান, এক সুতোয় বেঁধে নিয়েছে রাখী। বিয়ে হয়তো হবে একদিন।



৬

'আমি কি করতে পারি?' খদ্দরের হাফ-শার্ট-পরা মোটা চুরুট-কামড়ানো স্কুলের সেক্রেটারি হীরেনবাবু বললেন। উদাসীন স্বরে, খবরের কাগজের উপর চোখ বুলোতে-বুলোতে।

স্কুলের জানলার সব খড়খড়ি নামানো। এই দু' মাস। প্রথম মাসে সুজন পুরো মাইনে পেয়েছিল, এবার পেয়েছে আধা। কিন্তু এতে সে চালাবে কি করে? মা-বাবা ভাই-বোন সবাইকে দেশে পাঠিয়েছে, বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বিনে-ভাড়ায় উঠে এসেছে এক বন্ধুর ছাড়া-বাড়িতে, দারোয়ানের পার্ট নিয়ে। তবু মাঝে-মাঝে যেতে হয় দেশে, রেলভাড়া দিয়ে, লুকিয়ে কেরোসিন নিয়ে। অন্তত খানিকক্ষণের জন্যেও টেমি তো জ্বলবে একটা। আর কিছু চিনি। চিনি না হলে চা খেয়ে খিদে মারবে কিসে? তারপর, কিনে-কেটে রেখে আসতে হয় এটা-ওটা, ফুরিয়ে গেলে ফের করতে হবে মনি-অর্ডার। দু'জায়গার খরচ সে টানবে কি দিয়ে?

'রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা আছে তো ইস্কুলের, তাই থেকে দিন না।' সুজন দাবিদারের গলায় বললে।

'তার থেকেই তো আদ্ধেক করে দেয়া হচ্ছে। এমনি বেশি দিন চললে সিকিও হয়ে যেতে পারে।'

'আমরা কি তবে না খেয়ে মরব?'

চোখ তুলে তাকালেন হীরেনবাবু। 'কিসে মরো তার ঠিক কি।'

'তার আগে একটা চাকরি দিন জুটিয়ে। আপনার যদি বাঁচবার অধিকার আছে, আমারো তার চেয়ে কম নেই। বরং উকিল-

ব্যারিস্টারের চেয়ে মাস্টারের দাম বেশি। চেষ্টা করলেই তো দিতে পারেন একটা।'

'এ-আর-পিতে যাও। ঝেঁটিয়ে লোক নিচ্ছে।'

'গিয়েছিলাম। ফুসফুস ভাল নয় দেখে নিতে চায়নি।'

'ওরা আবার ফুসফুস দেখে নাকি ? তবে আর কি, হাওয়া খাও।'

'না, তার চেয়েও স্থূল কিছু খাব। আপনার এখানেই বাহাল করুন। দিন না, খবরের কাগজটা পড়ে দি চেঁচিয়ে। রোজ সকালে এসে এমনি শুনিয়ে যাব আপনাকে, আপনি মাইনে দেবেন। আপনার তো অনেক আছে, এমনি দিতে পারেন অকাতরে।'

'ভিক্ষে দিতে পারি, মাইনে দিতে পারি না। যদি ভিক্ষে চাও—' হীরেনবাবুর আনত মুখ গোল ও ভারি হয়ে উঠেছে।

'একজন এসে চাইছি কিনা, তাই এটাকে ভিক্ষে বলছেন। কিন্তু অনেকে যখন আসব, তখন ?'

আরো অনেকের কাছেই গেছে সুজন, অনাহূতের মত। কেউ এটাকে তার দাবি মনে করেনি, মনে করেছে প্রার্থনা, কেউ মনে করেনি এতে দৌরাত্ম্য ছাড়া কিছু ন্যায় আছে। কেউ বলেছে দেশে গিয়ে স্বাস্থ্য ফেরাও, কেউ বলেছে রিকশা টানো।

কৃষ্ণাকৃত কলকাতা। মনে হয় না এ কোনো দিন কলকলিতা ছিল। কোনো দিন ঝকমকিয়ে উঠেছিল তার সোনার মুকুট, ঝলমলিয়ে উঠেছিল তার সোনার আঁচল। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে আছে। হতচ্ছাড়ার মত। পথগুলি প্রায় নির্জন, আর নির্জন বলেই অত দীর্ঘ মনে হয়, বাড়ি-ঘর প্রায়ই শূন্য, রুদ্ধ, পরিত্যক্ত। গা-টা ছমছম করে। মনে হয় যেন বদ্ধশ্বাস পাথরের প্রেতপুরীতে চলে এসেছি। মোটর অনেক কমে গেছে, সাইকেল কখনো-সখনো চোখে পড়ে—নেই আর সেই ধৃষ্ট ধাবমানতা, সেই গতির গোঁয়ারতুমি। সব যেন কেমন গাধাবোট হয়ে

পড়েছে। ঝাঁপ পড়েছে দোকান-পাটে, কারু-কারু মুখ একেবারে দেয়াল দিয়ে গাঁথা। কেউ কারু সঙ্গে মন খুলে কথা কয় না, মুখ খুলে হাসে না, মেঘলা দিনের মত থমথমে হয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকে। সকাল-সকাল বাড়ি ফেরে। পথে বেরুলেই ষাঁড় আর পকেটমার, মাতাল না হয়েও খানায় পড়ে চোখ-নাক ধাঁদা করতে হয়। পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে বাজারে-বায়স্কোপে আর মেয়ে নেই, সেই সব ফোলানো-ফাঁপানো ফিনফিনে-মিনমিনে মেয়ে। শালীনবেশিনী গণিকারা শুধু নামজাদা রাস্তার মোড়ে-মোড়ে ঘোরাঘুরি করে, রেস্তরাঁতে বসে চায়ের কাপের উপর ঘণ্টা কাটায়।

তারপরে চাঁদ উঠে আসে। বীভৎস মনে হয়। কেমন কীটদষ্ট, কলঙ্কিত চেহারা। আতঙ্ক-কলঙ্কিত। আগে যখন আলোকমালিনী ছিল এ কলকাতা, শব্দস্ফূটিত, তখন তার মাঝে একটা কৃত্রিমতার সৌন্দর্য ছিল। এ-সব লোহালক্কড়ের মাঝে তার উপস্থিতিটা মায়া বুনত, সে-মায়া ছিল তার ম্লানিমায়, তার উপেক্ষায়। আজ সে নিদারুণ-রূপে নগ্ন, নির্লজ্জ, তার উপস্থিতিটা উৎপাতের মত। এর চেয়ে অরণ্যের অন্ধকার ভাল, গুহার অন্ধকার। যাও, এখানে কেন, এই ইটজর্জর ঠুনকো-ঠুঁটোর দেশে, যাও, যেখানে অঢেল মাঠ আর উদ্বেল সমুদ্র। যদি পৃথিবীতে কোনো শান্তির কুটির পাও, তখন না-হয় কারো শূন্য-শুভ্র বিছানায় ভেঙে পোড়ো। এখানে তুমি অপব্যয়িত।

অভাব—অভাব ছাড়া আর কোনো বোধ নেই সুজনের। এই অভাববোধ দিয়ে সমস্ত সংসারকে সে ছুঁতে পারে, পৃথিবীর দূরপ্রান্তের দূরদৃষ্টকে। সকলের সঙ্গে সে মনে-মনে মিতালি পাতায়। যে কাতরাচ্ছে রোগে, যে কোণে বসে থাকছে শিক্ষার অভাবে, যে নির্জিত-নির্জীব হয়ে পড়ে আছে শুধু দুমুঠা না খেতে পেয়ে। যে বাড়তে পারছে না, কাড়তে পারছে না। যে উটপাখির মত বালির মধ্যে ঘাড় গুঁজে

আছে। শুধুই কি অভাব, অপমান নয়? উপেক্ষিত শস্ত খুঁটে-খুঁটেই কি চলবে চিরকাল?

কিন্তু পুরশ্রীর অভাব কি? হীরেন খাস্তগিরের মেয়ে, দেদার পয়সা। তালুক-মুলুক, দালান-বালাখানার মেয়ে। হেলে-গড়িয়ে মানুষ হবার মত, পাউডার-পমেটমের কোমলতায়। সে কেন এ-পথে এসেছে, দুঃস্থ-দরিদ্রের দলে? প্রথম দেখলে মনে হয়, চটুকে, নতুন ফ্যাশানের জেল্লায় জমকে উঠেছে বুঝি। কিন্তু না, কাছে এলে টের পাওয়া যায়, জ্বালামালিনী মেয়ে। ঢ্যাঙা, বড বেশি সিধে, নল-খাগড়ার মত, বাড়তি চর্বি নেই কোথাও। খটখটে রোদের মত, মাজা কাঁসার মত ঝকঝকে। জাল-ছেঁড়া পোলো-ভাঙা মাছ। কাদা-ক্লেদের অনেক উপরে।

ওর মাঝে সুজন দেখতে পায় হীরেন খাস্তগিরের বরখাস্তের দিন। বাপের টাকা যে ছোঁয়না, তার মাঝে বিদ্বেষ নেই, আছে বিতৃষ্ণা। অনেকের চলে যাচ্ছে এত অল্পে, আমারই বা চলবে না কেন? শুধু আমি নিয়ে করব কি, যখন আর সকলেই এমনি রিক্ত, রক্তাক্ত থাকবে। আমার এই ব্যবহারটা বাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, বাবা যে প্রতিবেশের প্রতিনিধি তার বিরুদ্ধে। আমরা সমষ্টির দলে, আমাদেরও তাই সমগ্রকেই প্রতিরোধ। প্রাপ্তিতে তো আমাদের সমাপ্তি নয়, আমাদের সমাপ্তি পর্যাপ্তিতে। বাবার উপরেই যদি ক্ষুণ্ণ হতাম, তা হলে তাঁর টাকা দশ হাতে উড়োতাম, একমাত্র মেয়ে বলে আটকাত না একটুও। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছি বিরাট একটা ব্যবস্থার উপরে, তাই নত না হয়েও নম্র হয়ে আছি, নিঃস্ব না হয়েও হয়ে আছি নিঃস্বত্বের মত।

কি সুন্দর করে কথা বলে পুরশ্রী। কাজের যেমন জাদু আছে, তেমনি কথার আছে ইন্দ্রজাল। সমস্তটা ব্যক্তিত্ব বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। আর যেখানে ব্যক্তিত্বের ডাক সেখানেই অব্যক্ত আত্মার প্রতিধ্বনি। তবু, মুখে যাই বলুক, ওর মাঝে সুজন দেখতে পায় ভিত-নড়িয়ে-দেবার

প্রতিশ্রুতি, হীরেন খাস্তগিরের পরাস্ত-প্রস্থান। পাশাপাশি চলতে-চলতে অনেক কাছে এসে পড়ে। মিত্রতার সমতলে। অবন্ধুর বন্ধুতায়।

'হাতে হাত দিয়ে চলতে অত সংকোচ কেন?' পুরশ্রী অকুণ্ঠ হাত বাড়িয়ে সুজনের মৃদু, অলক্ষ্য স্পর্শকে মুঠোর মধ্যে নিমন্ত্রণ করে নেয়।

বলছেন, আরাম, কিন্তু মনের মত কাজ করতে পারার মত কিছু আরাম আছে? আঁমাদের এই কর্মটুকুই কি বিশ্রাম নয়, যদি ওদের কর্মক্লিষ্ট জীবনে এতটুকু অবসর এনে দিতে পারি? বলবেন, বিলাস, কিন্তু বলুন, এই মৃত, ক্ষুধার্ত, অশিক্ষিতদের শোভাযাত্রাটাও কি এই মনসবদার সমাজের বিলাস নয়? স্বপ্ন? সূর্যের স্বপ্ন ছাড়া রাত রাত-কাটাবে কি করে? আরো হয়তো কেউ বলবে, শুধু একটা ভঙ্গি, ভাবুনেপনা। হোক শুধু এটা ভঙ্গি, তাই বা কম কি? কিছু ক'রতে না পারি, শুধু ভঙ্গিটা ঠিক থাকে, শত ঘুরিয়ে দিলেও কম্পাসের কাঁটাটা ঠিক থাকে উত্তরে, তা হলেই তো চড়াইয়ের পথ উতরে গেলাম। শুধু প্রস্তুতি, শুধু একটি বিশ্বাস, তারই বা জোর কত।

তারা চলেছে দু'জন বস্তিতে, দুপুরের খরায়। ওদেরকে সাহস দেয়, কাজে লেগে থাকতে বলে, অনিশ্চয় শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার বিপদ বোঝায়। বলে, সবাই তোমরা যুদ্ধ করছ, যার-যার কাজে, যার-যার যন্ত্রতন্ত্রে। কুলি বস্তা টানছে, মিস্ত্রি কল ঘোরাচ্ছে, কামার লোহা পিটছে—সব তোমরা যুদ্ধের সেনানী। কাজে লেগে থাক, জয় তোমাদের, জয় আমাদের, জয় সমস্ত মানুষের, মানুষ-হয়ে-উঠতে-চাওয়া মানুষের।

গড়খাই কাটায়, ঢাকনিওলা ছিপা-ঘরের সুপারিশ করে। টিউবওয়েল বসায়, আগুন লাগলে জলের উপায় বাতলায়। দৈনন্দিন জীবনকে পরিচ্ছন্ন করবার জন্যে ছোটখাটো কাজে হাত লাগায়। লাঠি-বুরুশ দিয়ে নর্দমা পরিষ্কার করে, ময়লা কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করায়। স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন শেখায়, কি করে কলেরা-বসন্তর হাত এড়াবে

সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় করে। আর, আমরা যে সত্যি জিতব, আমাদের যে দিন ফিরবে, পবিত্রতায় স্নান করে উঠবে যে পৃথিবী, বারে-বারে তার মন্ত্র শোনায়।

স্বাধীনতা চাই আমরা, কিন্তু আমরা নিজেরা দিয়েছি স্বাধীনতা, যাদেরকে আমরা দিতে-পারি? ধরুন, এই মেয়েরা। এদেরকে আপনারা দড়িদড়া দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখেননি, সেই একই কায়েমি স্বার্থের অজুহাতে? ওদেরকে ব্যক্ত হতে দিয়েছেন? ওদেরকে সম্পত্তিতে অংশ দিয়েছেন, দিয়েছেন দান-বিক্রির অধিকার? আর, অবনত বলে যাদের জন্যে আমাদের মন কাঁদছে, তারা কি আমাদের পদানত নয়? কিসের জন্যে অস্পৃশ্য, অপাঙক্তেয়? চিরদিন যার পাশাপাশি থাকব, সেই মুসলমানকে কেন আমাদের অবিশ্বাস? কেন তার দাবি স্বীকার করব না, যে-দাবিতে নিজেকে সে নিরাপদ মনে করতে পারে? তাকে একবার নিরাপদ ভাবতে দিন, দেখবেন আপনিও নিরাময় হয়েছেন। ন্যায় করছেন ভেবে ন্যায় করুন, দেখবেন ন্যায় করেছেন বলে ন্যায় পাবেন। কটা চাকরি আর চাকতি, এই নিয়ে এত রেষারেষি। দেখবেন অফুরন্ত সুযোগ, দেশ যখন যন্ত্রান্বিত হয়ে উঠবে। তখন কত পথ, কত রোজগার, কত সমৃদ্ধি। ভাবুন, জারের রাশিয়া আর আজকের রাশিয়া। যে একদিন মাঠে ধান বুনত, সে আজ বিজ্ঞানের দিকপাল। যে একদিন নিরেট নিরক্ষর ছিল সে আজ প্রকাণ্ড সাহিত্যিক। ভাবুন তবে একবার আমাদেরো মাঝে রয়েছে কত প্রতিভার প্রতিজ্ঞা। কত অভাবনীয় সম্ভাব্যতা। শুনছেন?

চমকে ওঠে সুজন। বলে, 'ক্ষমা করবেন, আমি শুধু আপনাকে দেখছি।'

স্বগতোক্তি করতে-করতে হঠাৎ কারু উপস্থিতির চেতনায় অস্বস্তির মত পুরশ্রী ধাক্কা খায়। মনে হয় কণ্ঠস্বরটা একটু গদ্‌গদ, অজানা দেশের

কাকলী। পুরশ্রী হঠাৎ নিজের উপস্থিতিতে অভিজ্ঞাত বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আসে।

'বলুন, দেখতে পারলে দেখাও কি শোনা হয়ে ওঠে না ?' সৃজন তার ভঙ্গিতে যেন আলস্য আনে।

'যান, ইস্কুলমাস্টারের মত কথা বলবেন না।' পুরশ্রী প্রায় ঝামটা দিয়ে ওঠে।

পুরশ্রী যখনই তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তখনই এই ইস্কুল-মাস্টারির উপর ইঙ্গিত করে কেন ? মিথ্যে কি, সে তো স্কুল-মাস্টারই।

পুরশ্রীর সঙ্গে যায় সে তাদের আখড়ায়। তাঁতীকুল বৈষ্ণবকুল দুই কুল খুইয়ে যাঁরা ভিড়েছেন এসে বন্দরে। অনেক সার্বভৌম লোক আছেন। আসেন অনেক মালকোঁচা-মারা কবি, নকল দাঁতের তার্কিক, অম্লান প্রফেসর। বড় চাকুরে, বড় বেনে-ব্যবসাদার। গোলে হরিবোল বলে যারা কাজ সারে, ভিড়ের আসরে জায়গা রেখে যায় আগে থেকে। বড় বড় আলোচনা। ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে নতুন ইতিহাসের পত্তন করে। বলব না তাকে সাহিত্য, যাতে দুঃখী-দুর্গতের কাতরোক্তি শোনা যাবে না, নাচেও আনতে হবে এই মৃত্যুর ঝংকার। স্বীকার করলে চলবে না নর্দমার পাশেও ফুটে আছে ভুঁইচাঁপা। থাক, তবু ভুঁই দেখতে পারো, ভুঁইচাঁপা দেখতে পাবে না। চাঁদ রাতকে যে ভালো লাগায় সে কথা অনেক বলেছ, এবার বলো চাঁদের রাতে উৎসাদের আহ্লাদ ওঠে লেলিহান হয়ে। চলবে না আর ব্যক্তিগত প্রেম, ব্যক্তিগত ব্যর্থতা। স্বার্থের কথা অনেক হয়েছে, এবার বলো, সার্থের কথা।

বস্তুবাদী সম্পাদক বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা শুধু ভাষা শিখব।'

ঝাঁই-লঙ্কার ঝালের মত কথাটা লাগে এসে সৃজনকে। সে খেপে ওঠে: 'রবীন্দ্রনাথ যে সারা জীবন নির্যাতিত-নিগৃহীতের পক্ষ

থেকে প্রতিপক্ষতা করলেন সেটা শিখবেন না? শিখবেন না তাঁর বিশ্বজনীনতা?'

তুমুল তর্ক ওঠে ফেনিয়ে। আর সে-তর্কের অবসান হয় পুরশ্রীর একটি মর্মান্তিক কথায়. 'আপনি একেবারে পুরোদস্তর স্কুল-মাস্টার।'

যে বড়লোক সে যদি মুড়ি খায় তবেই সে উদার হয়, আর সে যখন গরিব তখন মুড়ি তো সে খাবেই! স্বজনের মনে হয়, সে যদি জমিদার বা ব্যবসাদার হত, তা হলে মানাত তাকে এই সাম্যবাদ, যে হেতু তার কিছু নেই, তাই তার মাহাত্ম্যও নেই কাণাকড়ির। যে বামন সেই তো চিরকাল উদ্বাহু।

এর পর আরো আছে। আন্তর্জাতিক সমাজ। অটবী রায় বিয়ে করেছে এক পোল-ইঞ্জিনিয়রকে, তবু সিঁথির এক কোণে রেখায়িত করে রেখেছে সিঁদুরের ক্ষীণ সংস্কার। সাহেব ধরেছে কুর্তা আর হেঁটো ধুতি আর তা অম্লানমুখে সহ্য করছে অটবী। দীপেশ বিয়ে করেছে এক ইংরেজ-মেয়েকে, আর তাকে শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে ব্যাদড়া, বিতিকিচ্ছি করে ছেড়েছে। কপালে-সিঁথিতে দিয়েছে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, মোটা খালি-পায়ে স্যাণ্ডেল। অপরিচিত লোক দেখে মাথায় ঘোমটা টানা যে কেন শেখায়নি স্বজনের আশ্চর্য লাগে। বিদেশিনী মেয়েকে দেখে যখন মুগ্ধ হয়েছিল দীপেশ, সে কি তার চামড়ার চটকে? তার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা, ভাষা-পোষাক, সংস্কার-সংস্কৃতি—সমস্ত কিছু দেখেই কি সে মনোনীত করেনি? তবে কেন এই প্রাদেশিকতা? সেই শাঁখা-সিঁদুরই যদি থাকবে, তবে গলায় জবাফুলের মালা ঝুলিয়ে যাও না কালীঘাট, ষষ্ঠীতলায় গিয়ে মানত করে এসো না।

স্বজন বোঝে এখানে তার কলকে নেই। সে নিচু বৃত্তি, নিচু পঙক্তির লোক, তার গায়ে ইস্কুল-মাস্টারের ল্যাবেল আঁটা। পুরশ্রী তাকে শুধু মাস্টার বলে না কেন? সে অনেক অন্তরঙ্গ, রহস্যময় নাম।

ইস্কুল কথাটা জুড়ে না দিলেই কি নয়? পুরশ্রীর ঠাট্টার মাঝেও নিষ্ঠুরতার শোভা ও স্বাদ আছে। কিন্তু এ ডাকের আড়ালে কিছুটা ঘৃণা, কিছুটা দূরে-ঠেলার ভাব কি অনুচ্চারিত নেই?

সেদিন কাজের কথা হচ্ছিল।

সুজন বললে, 'তা হলে মরে গেলে সংকার করাটাও কাজ, শ্রাদ্ধে কাঙালী-ভোজনও কাজ, ফুটবল-মাঠে চ্যারিটি-ম্যাচের টিকিট কেনাটাও কাজ।'

'কাজই তো।' পুরশ্রী রুখে উঠল: 'আজকের দিনে রিলিফই হচ্ছে একমাত্র রাজনীতি।'

'সাময়িক দুর্গতি একটা হবে বা হয়েছে তার জন্যে কাজটা দশের কাজ, কিন্তু যা হয়ে আছে তার প্রতিকারের কাজই হচ্ছে দেশের কাজ। আজ যদি আমরা একটা বিনে মাইনের স্কুল খুলি, ছেলে-বুড়ো মেয়ে-বুড়ি সবাইকে ডেকে এনে পড়াই, শেখাই, তা হলে বোধহয় কিছুটা কাজ হয়।'

'ইস্কুল মাস্টারের ঐ এক কথা। শুধু ইস্কুল খোলা। আটচালা আর পাঠশালা।' পুরশ্রী মুখ বাঁকালো। 'কিছু করতে হবে না আমাদের। শুধু মেইন সুইচটা টিপে দিতে হবে, দিকে-দিকে আলো উঠবে জ্বলে।'

'কিন্তু বাল্‌ব কই?' মনে-মনে প্রশ্ন করল সুজন।

বিমনায়মান সন্ধ্যা। দোতলা বড় বাড়ির নিচের একটেরে এক ঘরে সুজন থাকে। একলা। তক্তপোষে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই ঝাপসা একটুকরো আকাশ ও একটি তারা চোখে পড়ল। আকাশ গেল মুছে, তারাটা সবুজ হয়ে চোখের উপর চিকচিক করতে লাগল। নেহাৎই ওটা একটা তারা তাই অনেকক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করল সুজন। কিন্তু কখন কে জানে, হঠাৎ তার সেবার মুখখানা মনে পড়ে গেল। বোকা-বোকা মিষ্টি-মিষ্টি মুখ। কিন্তু কেন যেন বিষণ্ণ।

৭

শুধু বিষণ্ণ নয়, বিপন্ন আজ সেবা।

দু'-গরুর গাড়ি যাচ্ছে বনের পথ দিয়ে। বাঘ এল, গাড়ি ছেড়ে গাড়োয়ান বাঁদরের মত লাফিয়ে উঠে পড়ল গাছে। বাঘ পড়ল একটা গরুর উপর, আরেকটা গরু মন্ত্রমুগ্ধের মত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তার হত্যার প্রতীক্ষায়।

সেই আরেকটা গরুর মতই আড়ষ্ট, অসাড় হয়ে ছিল সেবা।

ডিহি-কাচারির এলেকায় জমিদারের আলাদা আস্তানা, সেগুন কাঠের পাটের দেয়াল, মেঝেটাও পাটাতনের, উপরে পেনটাইল। কেঠো, তুচ্ছ কটা আসবাব, জামকাঠের তক্তপোষ, খাড়া চেয়ার দুখানা কাঁঠালকাঠের, সমান পায়ে বসতে পারেনি এমন একটা কেরোসিন বাক্সের তক্তার টেবিল। বাবুগিরির মধ্যে ভেলকো বাঁশের চোঙের ফুলদানি করে তাতে কিছু ঘাস-পাতা গোঁজা, নামহীন কটা বুনো ফুলের ছিটে। তা ছাড়া আগাগোড়া কষ্টের কাঠিন্য। খায় কাহার-পাইকের হাতে, বলে, আর কিছু নয়, ঢেঁকিছাঁটা লাল কাবর চাল আর গেয়ে-গরুর দুধ। কাপড়-চোপড় হ্রস্ব, হাতে-কাচা। ঘরে একটাও আয়না নেই, বলে, নিজের মুখ দেখব আমি নির্বাপিতদের মুখে। নেই একটাও নগণ্য ক্যালেণ্ডার, বলে, আমার কাছে দিন নেই, চিরন্তন রাত্রি, যখন আসবে লাল তারিখ তখনই আমার বৎসরের আরম্ভ। ঘরের আলোটা পর্যন্ত নিরীহ, অল্পেতেই নিভে যায়। শুধু মনে হয়, বিছানাটাই নরম, তুলতুলে।

বারিধি তার গত জীবনের কাহিনী বলছিল সেবাকে, প্রায় বে-আব্রু করে। যে বিশ্বাসের থেকে সম্ভব সেই উদ্ঘাটন, সেই বিশ্বাস সেই

অন্তরঙ্গতা এসেছে দু' জনের মধ্যে। তরস্বী তুরঙ্গমের কাহিনী। ডুবতে-ডুবতে পারে-এসে-পড়া নাজেহাল জাহাজের। সেবার ভয় করছিল, কিন্তু সেই ভয়েই ছিল অপূর্ব ভেল্কি। তার মনে হচ্ছিল জোনের নিচে সে যেন দ্বিতীয় গরু।

শ্রীভূষণবাবুদের বাসা ছিল আগে এক ডাকের পথ, এখন একেবারে হাতছানির মধ্যে। ও-বাড়িতে জলের অসুবিধে, মেথরের আর নর্দমার, তা ছাড়া আনাগোনা বেড়েছে কালো কেউটে আর গরুর খুরওলা গোখরোর। কাচারি-বাড়ির রশি খানেকের মধ্যে খাস জমিতে একটা বেমেরামত বাড়ি পড়ে ছিল, সেটাকে জুতের করে নিয়ে সেখানে এনে বসাল ওদেরকে। খাজনা মিনাহা হল, একটা কিছু না দিলেই যখন নয়। জ্বালতি লাকড়ি লাগে না আর, মান্দাররা চাকরের কাজ করে দেয়, আনাজ-তরকারি আসে ঝুড়িতে করে, কলাই-মুশুরি, আখের গুড়ের ঠিলি। সব এ-বাড়ি ও-বাড়ি। নামঞ্জুর করবার মত মনের জোর কোথায়?

তা ছাডা পা-গাড়ি কেটে এখন তাঁত বসানো হচ্ছে।

আজ সন্ধ্যায় সত্যি সেবার মনে হল যেন বাঘের বিবরে এসে ঢুকছে। উচ্ছিন্ন-উদ্ভ্রান্ত চেহারা। ভয়ে চুপসে গেছে, ভাবনার ধুলো-পোকা খেয়ে-খেয়ে তাকে ঝর্ঝরে করে ফেলেছে। তবু মুখে হাসি টেনে সে বসল এসে চেয়ারে। দিনের শেষে এখন কি করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়, শুয়ে-শুয়ে ভাবতে-ভাবতে তন্দ্রা এসেছে বারিধির।

হুড়মুড় করে উঠে পড়ল সে। দেখল, সেবা। অদ্ভুত অসময়ে। কেমন যেন উন্মূলিত, বিধ্বস্ত।

স্তব্ধতার চমক কাটতে লাগল কতক্ষণ।

পড়ন্ত দিনের আলোয় তবু সেবার মুখে বিশীর্ণ হাসি দেখা গেল। বললে, 'এবার আমাদের বিয়ে করতে হবে—'

বারিধি যেন একেবারে বোবা হয়ে গেল। কাছাকাছি কোথাও একটা বোমা পড়লেও বোধহয় সে এত চমকাত না। গলা চিরে তার আওয়াজ বেরুল : 'বিয়ে ?'

চোখ নামিয়ে সেবা বললে, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে—'

অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল বারিধি। 'কি সন্দেহ হচ্ছে ?' জিগগেস করলে কৌতূহলাবিষ্টের মত।

সেবা দু' হাতে মুখ ঢাকল।

এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল বারিধি। ভোঁতা একটা মোচড় দিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। জলের মত তরল, এমনি ভাবের থেকে সে হেসে উঠল স্বচ্ছন্দে। নেমে দাঁড়াল তক্তপোষ থেকে। বললে প্রাণখোলা শাদা গলায়, 'তার জন্যে তুমি এত ঘাবড়াচ্ছ ? তুমি কি ছেলেমানুষ, সেবা।'

সেবা হাত সরিয়ে নিয়ে তাকাল খোলা মুখে। আর্তনাদকে গলা টিপে-টিপে যদি মূক করে দেয়া যেত, তেমনি তার মুখ।

'তার জন্যে বিয়ে করতে হবে একেবারে ?' হালকা পায়ে বারিধি একটু হেঁটে নিল ঘরের মধ্যে। 'চিরকালের জন্যে একটা নোনাধরা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে তুমি বন্ধ হয়ে যাবে ?'

'যাব।'

'তুমি কি যে বলছ তার ঠিক নেই। ভয় কি, আমার সঙ্গে চলো তুমি কলকাতায়।'

'সেখানে—'চোখ তুলল সেবা।

'সেখানে আমার চেনা ভাল ডাক্তার আছে। এ সব ব্যাপারে পাকা ওস্তাদ। অনায়াসে সব ঠিক করে দেবে।'

'কেন, বিয়ে ?' সেবা যেন সাত হাত জলের তলা থেকে বলছে।

'বিয়ে ? সে তো আর মুখের কথা নয়। এখুনি বিয়ে কি ? বিয়ের

জন্যে তৈরি হলুম কোথায় ?' বারিধি আরো কয়েক পা ঘুরে এসে সেবার প্রায় কাছে এসে দাঁড়াল। ষড়যন্ত্রীর গলায় বললে, 'ছোট্ট একটা ফোড়া অপারেশান করার চেয়েও সোজা। মিছিমিছি তুমি ভয় পাচ্ছ। আকছার, আকছার হচ্ছে।'

সমস্ত দেশ, যুদ্ধ, মৃত্যু, ভাবীকাল—সব কিছু মিথ্যে, অনর্থক হয়ে গেল। তলিয়ে যাবার আগে আরেকবার হাত তুলল সে। বললে, 'আপনি তো বলতেন বিয়েই একমাত্র সত্য ও স্থির হয়ে আছে এই ভেঙে-পড়া সংসারে। বলতেন না ?'

'বলতাম হয়তো। কিন্তু তার মানে কি তোমার-আমার বিয়ে ?'

এমনিই হবে এ যেন অনেক আগেই সেবা পড়ে নিয়েছিল দেয়ালে . মেঝের উপর তাকিয়ে রইল, শূন্য নিস্পন্দ চোখে। অনেক পর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি তবে কি করব ?'

'আমার সঙ্গে কালই চলো কলকাতায়। ডাক্তারের চমৎকার ক্লিনিক আছে। হেঁজিপেঁজি নয়, ঝানু ডাক্তার। খুব সহজেই হয়ে যাবে বন্দোবস্ত। কি, যাবে ?'

'না।'

'এ তোমার বাজে বোকামি। মিথ্যে সেন্টিমেন্ট।' বক্তৃতায় কে পারবে বারিধির সঙ্গে ? 'হত্যার ভয় করছ ? বাঁচবার জন্যে দিনে-রাতে কত অজস্র আমরা হত্যা করছি, পোকা-মাকড়, পশু-পাখি, সাপ-খোপ —কি এসে যায় ! যা অবান্তর, অকেজো, যা জীবনের বাইরে, জীবনের বিরুদ্ধে, তাকে বধ করে ফেলাই তো কর্তব্য একশো বার। তারপর আবার তুমি মুক্ত, নির্মল, যে-কে-সে। সেটা ভাল, না, এই দেহধারী আত্মহত্যাটা ভাল ? বিচক্ষণের মত চারদিক ভাল করে ভেবে দেখ।'

তবে কি সেবা এবার খান-খান হয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে ?

কেঁদে নদী বইয়ে দেবে ? কিংবা উঁচু গলায় রাষ্ট্র করে দেবে এই অকীর্তি ? তাকে বাধ্য করাবে বিয়ে করতে, নিরুপায় পরাভূতের মত ? তারপর ? কোথায় তার আশ্রয়, কি তার পরিণতি ? বাসি খবরের কাগজের মত সে তখন বিক্রি হবে না মুদির দোকানে ?

'কাল সকালের ট্রেনেই চলো। আমার সঙ্গে যেতে দিতে তোমার বাবা-মা মোটেই আপত্তি করবেন না। বলব, পার্টির কাজে যাচ্ছি।'

'না, না, না।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অকস্মাৎ ককিয়ে উঠল সেবা।

বারিধির অল্প-অল্প ভয় করতে লাগল। আলো-আঁধারি এ সময়টাই ভারি বিশ্রী, গা ছমছম করে। তাড়াতাড়ি জ্বালালো লণ্ঠন, বাড়িয়ে-কমিয়ে শিখাটা স্থির, পরিমিত করে নিল। না, ভয় কিসের ? তার বলিষ্ঠ আশ্রয় আছে। সে-আশ্রয় হচ্ছে নিটোল অস্বীকারে। পরিষ্কার প্রত্যাখ্যানে। চরে বেড়াতে দিয়েছেন মেয়েকে, এখন বুঝি আমাকে শাঁসালো দেখে শাসাতে এসেছেন—এই উত্তরে। উপায় কি। সেবা অবোধ হবে বলে সে নির্বোধ হতে পারে না। তাকে বাঁচতে হবে, আর বাঁচার জন্যে এই ভঙ্গিটাই বৈজ্ঞানিক।

'আমাকে সেই ডাক্তারের নাম ও ঠিকানাটা লিখে দিন।' সেবা বললে কৃতসংকল্পের মত।

তক্ষুনি লিখে দিল বারিধি। বললে প্রায় নিজের কানে-কানে, 'আমি সঙ্গে গেলেই ভাল হত।'

সেবা উঠে পড়ল এক ঝটকায়। সে একা, অসম্পৃক্ত এই ভঙ্গিতে। দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সে, ফিরে এল। বললে, 'আর, আমাকে কিছু টাকা দিন।'

'কত ?' যেন হাড়ে খানিক বাতাস লাগল বারিধির।

'যত পারেন।'

বারিধি বাক্স খুলে এক তাড়া নোট দিল তার হাতে। বুকের মধ্যে

ফেলে দ্রুত বেরিয়ে গেল সেবা। কেউ আলো দেখাবে বলে দাঁড়াল না এক নিশ্বাস।

পাথর-জাঁতা রাতটা সেবার কাটল অন্ধকারের দিকে চেয়ে থেকে-থেকে। এক নিশ্বাসের জন্যেও নিজেকে বিস্মৃতির মধ্যে ডুবতে না দিয়ে। সকালবেলা মাকে সে বললে, ঠিক বললে না, বুঝতে দিলে। মেয়েরটা মার বুঝতে দেরি হল না। মায়াময়ী প্রথমে বিমূঢ়ের মত হয়ে গেলেন, পরে মেয়ের গলা অমন স্পষ্ট ও স্থির দেখে যেন কিছুটা ভরসা পেলেন। বললেন, 'বারিধিকে বলেছিস ?'

'না।'

'না ?' মায়াময়ী যেন টলে পড়বেন মাটিতে। 'আজই, এক্ষুনি গিয়ে বলবি। তুই না বলিস আমি গিয়ে বলব।' একটা বিনিশ্চিত স্বপ্নের উপর দাঁড়িয়েছেন, ঠিক তাঁর ততখানি দৃঢ়তা।

'না। ও নয়।'

'ও নয় ?' টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লেন মায়াময়ী। আলুথালু চুলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মেঝের উপর।

'না। ও নয়। ও কি আমার যোগ্য ?'

'তবে কে ? কে পোড়ারমুখি ?' জোরে হাত ধরে টেনে মায়াময়ী মেয়েকে বসিয়ে নিজের কাছে নিভৃত করে নিলেন।

সেবা ঢোঁক গিলল, চুপ করে রইল।

তার এক গোছা চুল সজোরে টেনে ধরে মায়াময়ী চাপা-গলায় জিগগেস করলেন, 'কে তবে ? আমাকে শিগগির বল, হারামজাদি।'

সেবার গলা এতটুকু কাঁপল না। বললে, 'সুজন।'

বন্ধ ঘরে সেবার হাড় এক ঠাঁই ও মাস এক ঠাঁই হয়ে গেল। কিল, চড়, লাথি দোহাত্তা চালাতে লাগলেন মায়াময়ী। শ্রীভূষণবাবু এসে

যোগ দিলেন। এক পায়ের চটি নিয়ে সেবার পিঠে হাঁকড়াতে লাগলেন ইচ্ছেমত। রাগে, ক্ষোভে, অপমানে দুজনেই যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। সেবা একটা টুঁ শব্দ করল না, চোখের জল ফেলল না এক ফোঁটা। ভাবল, এ তার ন্যায্য প্রাপ্য, কে জানে, প্রাপ্যের চেয়ে হয়ত কম। আরো, আরো তাকে মারা উচিত, ক্ষতবিক্ষত করে দেয়া উচিত। ঘরের মধ্যে কেন, বাইরে, লোকারণ্যে। উচিত প্রতিফল যে তার কী সুদূর সর্বনাশে তা তো সে কিছু এখনো দেখতেই পাচ্ছে না।

শুধু একবার সে বললে, 'কেন, ইস্কুল মাস্টারে তো শেষকালে তোমাদের আপত্তি ছিল না।'

ঘোরতর আপত্তি। সুজন না হয়ে বারিধি হত, যা হোক তাঁরা চোখ ঠারতেন। বরং সেই দিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন হালের মুখ। এত কাঠ-খড় করে এই পরিণতি! ইস্কুল মাস্টার কেন, মেথর মুদ্দাফরাসেও আর অরুচি নেই। ইস্কুল মাস্টারকে দিতেন তাঁরা হাতে ধরে, যা থাকে অদৃষ্টে, হজম করে নিতেন। কিন্তু এ কি কেলেংকারি। এ কি নোংরামি। এত পাপ, এত অপমান। এত বড় পরাজয়।

হাতের কাছে ভাঙা ছাতাটা এবার তুলে নিলেন শ্রীভূষণবাবু।

সেবা অজ্ঞান হয়ে টলে পড়ল মেঝের উপর।

৮

চোখ চেয়ে দেখল, সে মরেনি। এবার বোধহয় আবার তাকে মারবে। মারুক। সে এবার আর মাঝখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে না।

কিন্তু, না, শ্রীভূষণবাবু তাকে কলকাতা নিয়ে চললেন। দু'হাতে দু'গাছ শুধু চুড়ি রেখে সব খুলে রাখলেন গয়না, সাধারণ দুটো শাড়ি-সেমিজ দিলেন শুধু ঠনঠনে টিনের প্যাঁটরায়। সমস্ত রাস্তা ভুলেও একটাও কথা কইলেন না। আগাগোড়া চোখ বুজে রইলেন।

তবু, কলকাতা। যেখানে এখন আসন্ন মৃত্যুর ছায়া। সে মরবে, মুক্তির তার আশা আছে এই শুধু তার গোপন সান্ত্বনা।

ভাটির ট্রেন এখনো ফাঁকা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন অন্ধকার ঠেলে চলেছে কোন ধ্বংসের গহ্বরে। জানলায় এক ভাবে ঠায় বসে থাকে সেবা, গা মেলবার জায়গা থাকলেও শুতে ইচ্ছে করে না। অন্ধকারে পৃথিবীকে কি গণ্ডিহীন ও প্রকাণ্ড দেখায় তাই সে অনুভব করে বুকের মধ্যে। আশ্বাস পায়, তার জন্যেও জায়গা একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।

ছ্যাকড়া গাড়ি করে ইস্টিশান থেকে সোজা চলে এলেন সুজনের বাড়িতে। মেসে খাবার আর পয়সা নেই বলে সুজন বিনা-স্পিরিটে শুধু কেরোসিন দিয়ে স্টোভ ধরাবার চেষ্টা করছিল, দরজায় ঘোড়ার গাড়ি দেখে চমকে উঠল। এমন এখনো আশা করা যায় না যে কলকাতায় কেউ বেড়াতে আসবে। কে জানে, দেশের বাড়ি থেকে বাবা-মারা চলে এলেন নাকি না বলে-কয়ে। না, এ কি আশ্চর্য, সেবা আর শ্রীভূষণবাবু।

তাকে দেখেই, কিছু বুঝতে না দিয়েই, শ্রীভূষণবাবু তেলে-বেগুনে

জলে উঠলেন। 'স্কাউণ্ড্রেল, বদমাস, আমাদের সঙ্গে এ কেলেংকারিটা না করলে তোমার চলত না ?' হাতের ছাতাটা মুঠো করে চেপে ধরে শূন্যে নাড়তে লাগলেন ঘন-ঘন, ইচ্ছেটা দু' ঘা বসিয়ে দেন মাথার উপর। 'ছুঁচো, পাজি, ছোটলোক, সদর বন্ধ করে দিয়েছিলাম বলে মফস্বল দিয়ে তুমি বাড়ি ঢুকলে ? তারপরে এই কাণ্ড ?'

'কী হয়েছে ?' সুজন আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না।

'কী হয়েছে। ন্যাকা সাজছেন। হারামজাদ, জোচ্চোর কোথাকার। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। কিন্তু বলে যাই যাবার আগে, যেন বোমা পডে একসঙ্গে মরো তোমরা দু'জন। এ যুদ্ধে অনেক পাপের শোধন হচ্ছে, যেন তোমরা দু'জন যত শিগগির হয় লোপাট হয়ে যাও।' বলে যে গাড়িতে এসেছিলেন সেই গাড়িতেই ফের চলে গেলেন স্টেশনের দিকে।

সেবা দেয়ালের সঙ্গে লজ্জায় মিশে ছিল, ময়লা চাদরে মুখ ঢেকে। ধরণী দ্বিধা হয়নি বলেই। বড় বেশি তাকে রুগ্ন ও রিক্ত দেখাচ্ছে। নষ্ট, নিঃসঙ্গ।

'কি হয়েছে সত্যি ?'

'আমাকে তুমি বাঁচাও।' সেবা হঠাৎ সুজনের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। 'তোমার পায়ে পডতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই, মাথা কুটে মরতে পেলে ধন্য হয়ে যাব। বল, তবু, বাঁচাবে আমাকে ?'

'নিশ্চয়ই বাঁচাব।' দু'হাত দিয়ে তুলে সেবাকে সে দাঁড করিয়ে দিল। 'বিপন্ন হয়ে' আমার কাছে এসে পড়েছ, আর বাঁচাব না আমি ? সমস্ত লাঞ্ছনা সমস্ত পীড়ন থেকে তোমাকে বাঁচাব। কিন্তু, বলো, হয়েছে কি ?'

সেবা মুখ ঘুরিয়ে নিল। বললে, 'ঘোরতর পাপ করেছি, তার স্খালন নেই, মার্জনা নেই,—তবু তোমার কাছেই আমি এলাম।' সেবার দু' চোখ জলে ফেটে পড়ল।

'তবু আমার কাছেই তো আসবে। একমাত্র প্রেমের কাছেই তো সমস্ত পাপ ক্ষমা পায়। সমস্ত ভয় চোখ বোজে। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, চলো ভিতরে। আমার হাত ধরো। তুমি কাঁপছ।'

হ্যাঁ, এত বড বাড়িতে নিচের তলায় ঐ একখানি শুধু আমার ঘর। আমি বিনে-ভাড়ার চৌকিদার। ইচ্ছে করলে এক-আধখানা বাডতি ঘর পাওয়া যায়, কিন্তু চলে যায় এই একখানায়ই। এখন তুমি এসেছ, ইচ্ছে করছে ঘরটা আরো ছোট, ঘন করে আনি। হ্যাঁ, বিছানাটা আমার অমনি চব্বিশ ঘণ্টাই পাতা থাকে, তুমি বড্ড অসুস্থ, দুর্বল, বিছানাতেই শুয়ে পড়ো। না, না, মেঝেতে শোবে কেন? আমার বিছানাটা এমন কিছু পরিচ্ছন্ন নয়, তার অনেক অনিদ্রার যন্ত্রণা এবার স্নিগ্ধ হবে তোমার বিশ্রামে। বা, আমাকে ছুঁতে দেবে না তোমাকে? সেবা, জান না তুমি আমার কে? কত দূর থেকে কত ক্লান্তি নিয়ে তুমি এসেছ, আর তোমার কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারব না? ঘুমোবে একটু? সত্যি, তোমাকে কিছু খেতে দিতে পারলে হত। কি নরম হয়ে পড়েছ তুমি। একটু দুধ, একটু চা অন্তত। আশ্চর্য, কিছু খেতে দেবার নেই। স্টোভটা পর্যন্ত এখনো ধরাতে পারিনি। এ কার কাছে এলে তুমি?

বিষাদ-অনিমেষ চোখ দুটি সুজনের মুখের উপর তুলে ধরে সেবা বললে, 'আমাকে তুমি বিয়ে করবে?'

'সে তো কবেই হয়ে গেছে।'

'জানি। কিন্তু আইন যাকে বিয়ে বলে, সমাজ যাকে বিয়ে বলে, তেমনি?'

'একশো বার করব। মানে একবারই করব।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, তোমাকে। আগে করিনি, বুঝিনি প্রয়োজন। এখন বুঝছি,

বিয়ে দিয়ে ঢেকে দিতে পারব তোমার সব লজ্জা, সব লাঞ্ছনা, তাই আজকেই তো বিয়ে করার দিন।'

সুজনের দু'হাত গলার নিচে চেপে ধরে সেবা বোজা চোখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'বিয়ের দিন বুঝি লোক কাঁদে? ঠিক হয়েছে, উপোস করে থাকতে হবে দুজনকে।'

বুকের ভিতর থেকে দশ টাকার একটা নোট বের করল সেবা। বললে, 'যাও, কিছু খাবার নিয়ে এস। দু'জনে মিলে খাব। মার ছাড়া দু'দিন আর কিছু খাইনি।'

'এত টাকা!'

'কার টাকা, কোত্থেকে পেলাম জিগগেস কোরো না।'

'কার অমন মাথা-ব্যথা পড়েছে! চেয়ে-চিন্তে বা চুরি করে টাকা একবার হাতে পেলেই হল। আর এ তো দস্তুরমত বরপণ।' সেবাকে একটু হাসিয়ে সুজন চলে গেল বাজারে।

সর্বাঙ্গে ব্যথা। নড়া যায় না। তবু প্রসারিত হয়ে এ বিছানার স্নেহ সর্বাঙ্গ ভরে তার ছুঁতে ইচ্ছে করে।

ঠোঙা করে শুধু খাবারই নয়, কিছু চাল-ডাল চা-চিনি সুজন কিনে এনেছে। এসে দেখে সেবা এরি মধ্যে স্টোভ ধরিয়ে জল চাপিয়ে দিয়েছে, রাস্তার গয়লার থেকে জোলো দুধ কিনেছে খানিকটা, ফিরিয়ালার থেকে কতক রুখা-শুখা তরকারি। এরি মধ্যে গোছগাছ করে নিয়েছে ঘর-দোর। ঘরের সমস্ত শীর্ণতা সমস্ত দারিদ্র্য যেন স্নিগ্ধ হয়েছে তার হাতের মমতায়।

রান্না করল সেবা। আর যেন নড়া-চড়ায় সেই ব্যথা নাই, শুধু অতল অবসাদ। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বেরুবে সুজন। চাকরির খোঁজে। যে কোনো চাকরি। ব্যাঙের ছাতার মত এক ব্যাঙ্কে হবে বলে আশা

আছে। আশার কুটোটিও সে ছাড়বে না। তোমার ইস্কুল? খোলেনি এখনো। দশটি করেও যদি ছেলে ফিরে আসত, তবে খুলত নাকি। মাইনে দিচ্ছে আদ্ধেক করে। কি করে চালাই দু' সংসার? দেখি, হয়ে যেতে পারে কিছু কোথাও। একা-একা তুমি বাড়িতে থাকতে পারবে তো? পারব না? আমি কি আর সত্যি একা?

যেন কোথাও একটা অন্ধ অস্থিরতা ছিল, অনিশ্চয় আর অপচয়, বিস্রংস-বিশৃঙ্খলা। যেন কোন কিছুই টিকবে না, সব কিছুই ফুরিয়ে যাবে এমনি ত্বরান্বিত পরিভ্রমণ। যেন দমিত ও দণ্ডিত আত্মার আর্তনাদ। প্রতিশোধের প্রতিরূপ। যেন অনেক বেশি উগ্র, অনিবার্য, স্থিরলক্ষ্য। যেন অজগরের গ্রাস। অপ্রতিরোধ্য। কে জানে, এই হয়তো পরমতম মূল্যদান। দুর্লভকে কিনে নেবার। বঞ্চিত মাটি হয়তো এতেই তৃণাঙ্কিত হবে।

সব ঠিক আছে। নড়ে যাক, ঝরে যাক, তবু ঠিক আছে। আছে প্রেম। আছে ক্ষমা। আছে জীবন থেকে নবজীবনে নিয়ে যাওয়া। সমস্ত উদ্বেলতার তলে আছে স্থির সাম্য, স্থির শান্তি। স্খলিতের প্রক্ষালন। প্রেমে ধৌত হচ্ছে পাপ, সাম্যবাদে ধৌত হচ্ছে ধনিকতা।

রাত্রে বলল সব সেবা। আলো-না-জ্বালা অজানা অন্ধকারে। বলল চেতনার আবছায়ার মধ্যে।

'হ্যাঁ, দয়া করো। নাম বোলো না।' সুজন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

সেবা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে রইল। অবলুপ্তের মত।

এমনি ভাবেই ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিল সুজন। ঘৃণা নয়, তার করুণা হল নতুন করে। বললে, 'সন্তান কখনো অবৈধ হয় না, অবৈধ তার বাপ-মা।'

একটা অশরীরী দীর্ঘশ্বাস ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের মধ্যে।

'কোন প্রাণই সংসারে ব্যর্থ নয়। অন্তত আমরা হতে দেব না

আর। মনুষ্যত্বেই তার পরিচয়, পিতার পরিচয়ে নয়। জবালার কোলে যে জন্মায় সেও সত্যকাম হয়। হ্যাঁ, আমরাও তাকে সেই সুযোগ দেব, সেই পরিবেশ। দেখবে সে প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক হবে, কি কবি হবে, হবে সেনাপতি। যেমন আমি, তুমি, তেমনি সে। সব আলাদা, সব সমান।'

সেবা স্নান করে উঠল। প্রণাম, আলিঙ্গন, সর্ববিলোপ—ভেবে পেলনা কি করে প্রকাশ করবে নিজেকে ?

রাতে শুলো তারা পাশাপাশি, তক্তপোষের অন্তিম দুই প্রান্তে, কেউ কাউকে না ছুঁয়ে। সেবা মেঝেতে শুতে চেয়েছিল আলাদা হয়ে, দেয়নি সুজন। বিষয়টাকে ঘোলাটে আবেগের মধ্যে দিয়ে দেখো না, ত্যাখো মুক্তি ও সংযমের চোখ দিয়ে। বুদ্ধিকে জীবিত করো, আবেশকে নয়। সেবা যেন দুর্গের আশ্রয়ে এসে শুলো, স্বর্গ নেই কোথাও শূন্যতলে, তবু মনে হল, যেন স্বর্গেরই এলেকায়।

তবু কি সুজন এতটুকুও আশা করেনি যে ঘুমের অসাবধানে সেবার একটি অসংলগ্ন স্পর্শ এসে তার গায়ে লাগবে ? না, এই তো চাই, এই দৃঢ়তার চেতনা। বোধ, ধৃতি, প্রতীক্ষা : বিজ্ঞান-শাসিত দৃষ্টি। আর সেবা—সেবা কি করে আশা করতে পারে যে অজ্ঞানেও সুজন তাকে ছোঁবে ? সে ব্রতঘাতী, সে ব্রাত্য। সে মসীলিপ্ত। খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ।

সমস্ত জীবন চলবে এই ব্যবধান। এই দ্বিধা আর সংকোচ। মিলনের বিস্তৃতির মধ্যেও এর বিস্মৃতি হবে না। ঘৃণার সঙ্গে দয়া মিশিয়ে জেগে থাকবে অনুকম্পা। দানের বিনিময়ে গ্রহণে থাকবে কার্পণ্য। অগাধ অতৃপ্তি।

অসম্ভব।

পাখা-কাটা পাখির মত সেবা সমস্ত রাত ছটফট করে কাটাল। কিন্তু সুজন কি নিশ্চিন্ত শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। কি পরিপূর্ণ বিশ্বাসে! ঈশ্বর, নামোচ্চারণ করবে না বলে ভেবেছিল, মৃত্যু ছাড়া কি মুক্তি

নেই, বিষমুক্তি ? কেন একে জড়ালাম ? শুধু একটু স্থান বা প্রতিষ্ঠার জন্যে ? কেন এর সমস্ত জীবন কালি করে দিলাম ? খালি করে দিলাম ? কেন নিজে বয়ে গেলাম না, ক্ষয়ে গেলাম না ? কেন দাসী না হতে চেয়ে স্ত্রী হতে চাইলাম ? কি দেব আমি অর্ঘ্য ? এই স্পৃষ্ট দেহ ? এই পঙ্কিল মন ? ট্রেন যখন ঢুকছিল স্টেশনে, কেন তখন পড়লাম না এঞ্জিনের সামনে ? কেন গুঁড়ো হয়ে গেলাম না ? তার বদলে এই দগ্ধ শলাকা বুকে নিয়ে বাঁচতে এসেছি ?

৯

ডাক্তারের নাম সঞ্জীবন সিংহ। উগ্র ডিগ্রিওলা, পশ্চিম-প্রত্যাগত। ঠিকানাটা আরেকবার দেখে নিল সেবা।

দুপুরবেলা, ঘরের দরজায় সে তালা দিয়ে এসেছে। বিকেলে, সুজনের ঘরে ফেরবার আগেই, হয়তো ফিরতে পারবে। যদি না পারে, যদি অপারেশান-টেবিলেই সে মরে যায়, সে বেঁচে যায় তা হলে।

অনেক লজ্জা, অনেক লাঞ্ছনা। তবু, ডাক্তারের কাছে কুণ্ঠা কিসের? সে পরিত্রাতা, পবিত্র ঈশ্বরের মত। সে দূর করে ব্যাধি আর যন্ত্রণা, মুক্তি দেয় নবীকৃত জীবনে। আয়ু আর আরোগ্যের উদ্গাতা সে।

বয়েস চল্লিশের কিছু উপরে হবে। স্থূল, স্বাস্থ্যবান। গম্ভীর। দেখলে নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। মনে হয় বিশ্বাস করা যায় বিরলে। যেন অনেক অভিজ্ঞতায় শক্ত, অনেক বিকৃতিতেও অবিচলিত। শুধু চাউনিটা দূরবেধী, হয়তো বা একটু নগ্ন। এই কলঙ্কিত লজ্জাটা যেন একটু উপভোগ করে। কিন্তু মুখে উদার হাসি। বরাভয়।

এটা তাঁর বাড়ি। নিচের তলায় ডাক্তারখানা। রুগী দেখবার ঘর, যে সব রুগী শিষ্ট। অনভিযুক্ত। তাঁরা বাইরের ঘরে। আর, তাদের মতন যারা রুগী, যারা গুপ্তগতি, তাদের ক্লিনিকটা অন্তরালে।

হ্যাঁ, সঞ্জীবন সিংহ মেয়েদের ডাক্তার। বিশেষজ্ঞ।

ঠিক সময়েই এসেছেন। হয় দুপুরে, নয় অনেক রাত করে। যে-দুটো সময়ই একটু নিরুদ্বেগ। আসুন ভিতরে। কিছু ভয় নেই। ঘরোয়া রুগী হতে চান, জায়গা আছে আলাদা।

ডাক্তার সেবাকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে এলেন। এটা পরামর্শের ঘর। গৌরচন্দ্রিকার। ফর্দ-ফিরিস্তি না নিয়ে তিনি কাজে হাত দেন না। রোগের বায়নাক্কা জানা চাই।

'আমাকে আপনি গোপন বন্ধুর মত মনে করবেন। আপনার নাম ?'

'সত্যি-নাম বলতে হবে ?' সেবা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল ভয়ে-ভয়ে।

'আপনি নেহাৎ গোবেচারা। সত্যি-নাম কেউ বলে ? বানিয়ে বলে ফেলুন না একটা।'

'সুপ্রীতি সান্যাল।'

'বানান করতে পারব কিনা কে জানে ? নাম দরকার, একটা নির্দোষ প্রেসক্রুপশান করে দিতে হবে তো। খাতায় রাখতে হবে নকল। যাক গে, অনেক ঝামেলা, তা আপনি বুঝবেন না। যাক গে, এই প্রথম ?'

সেবা ঘাড় হেঁট করে রইল।

'মানে, এর আগে এসেছেন আর কোনো ক্লিনিকে ?'

'না।'

'কীর্তিমানটি কে ?'

'তার নামও কি বানিয়ে বলতে হবে ? দরকার আছে ?' সেবা দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণ কামড়ে ধরল।

'কিছুমাত্র না। জিগগেস করছি, সমাজকে বুঝতে চাইছি। লোকটা কি ঘরের না বাইরের ?'

'জানি না।' সেবা দৃঢ় গলায় বললে।

'কেউ সঙ্গে আছে আপনার ?'

'না।'

'অভিভাবকেরা জানে ?'

'না।'

'আমার ঠিকানা জানলেন কি করে ?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি মেয়ে, সে বলেছে। তার দিদি নাকি এখানে এসেছিল।' সেবা অম্লানমুখে বললে।

'আশা করি সে নিজে আসবে না।' ডাক্তার বদান্যমুখে হাসলেন। তক্ষুনি মুখ ঘোর করে বললেন, 'কিন্তু আপনার দায়িত্ব নেবে কে ?'

'ঈশ্বর।' আর কোনো নাম সেবার মুখে এল না।

'ঈশ্বর ?'

'হ্যাঁ, আপনিই আমার সে-ঈশ্বর। আমি আমার সমস্ত দায়িত্ব আপনার হাতে তুলে দিলাম। আর যদি কেউ দায়িত্ব নেবে তবে ছুটে আপনার কাছে পালিয়ে আসব কেন ?'

'আমার ফি একশো টাকা। দিতে পারবেন ?'

ভেবেছিলেন অক্ষমতা জানালে ছেড়ে দেবেন খানিকটা। ঋণী করে রাখবেন।

'দিচ্ছি।' আঁচলের তলা থেকে ন্যাকড়ার পুঁটলি বের করে সেবা দশখানা নোট গুনে দিল। ডাক্তার দেখলেন, আরো কতগুলি আছে। বড ঘরের মেয়ে, সন্দেহ কি। পাপের জৌলুস যেন তাতে আরো বেড়ে গেল।

'আসুন।'

তারা আরো ভিতরে ঢুকল, যন্ত্র-ঝলমল আরেকটা ঘরে। অনাবৃত স্তব্ধতায়।

কতক্ষণ পর ডাক্তার বেরিয়ে এলেন পরীক্ষাগার থেকে। সেবাকেও আসতে বললেন। ভয়ে ছাই হয়ে বেরিয়ে এল সেবা।

'আপনি একটি পয়লা নম্বরের আনাড়ী। আপনার কিচ্ছু হয়নি।' ডাক্তার বললেন প্রায় হতাশের মত।

'কিছু না ?' জিজ্ঞাসাটা সেবার কথায় ফুটল না।

'কিছু না। দুই আর দুই দেখেছেন, সোজাসুজি চার করে বসে আছেন। এখন দেখতে পাচ্ছি, শূন্য। যান, মনের সুখে দৌড়-ঝাঁপ ছুটোছুটি করুন গে।'

এখুনি সে ছুটে বেরিয়ে পড়বে কিনা, সেবার দু' পা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

'যাবেন না এখুনি। প্রেসক্রপশান লিখে দেব একটা, ওষুধ নিয়ে যাবেন। যে সাময়িক অস্বাস্থ্য হয়েছে, ভাল হয়ে যাবে।' ডাক্তার কাগজ-কলম তুলে নিলেন, 'এবার আপনার সত্যিকার নাম বলতে আপত্তি হবে না আশা করি।'

সেবা উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'সেবা—সেবা দত্ত।'

'ঠিকানা?' টলটলে চোখে ডাক্তার হাসলেন।

'ঠিকানা দিয়ে কি হবে?'

'সিঁড়ির এক ধাপে পড়েছেন বলে ধাপে-ধাপেই পড়বেন আর বারে-বারে আমার শরণ নিতে হবে, সে কথা আমি বলছি না। আপনার এখানে আসা আর না হতে পারে, কিন্তু আমি তো যেতে পারি আপনার ওখানে।'

'আপনি যাবেন কেন?'

'সাধে কি আর আপনি তিলকে তাল করেন? বলছি, এর পর যখন আপনার বিয়ে হবে, আর সঙ্গত কারণ ঘটবে, তখনো তো আপনাকে মুক্ত করবার জন্যে আমার ডাক পড়তে পারে?' ডাক্তার টালটা চমৎকার সামলে নিয়েছেন।

প্রসন্ন নিশ্চিন্ততায় সেবা ঠিকানা বললে।

প্রথম চশমা পরলে সমস্ত যেমন আশ্চর্য দেখায়, তেমনি। সেবার ইচ্ছে হল, এখুনি ছুটে গিয়ে সুজনের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নির্বারণ ব্যাকুলতায়, বলে, কানে-কানে বলে, দেহের অণুতে-অণুতে বলে, না,

না, না। কিন্তু তখুনি সে হোঁচট খেল। যদি তাকে মুক্ত দেখে সুজন আগের মত পিছিয়ে যায়, বিয়েতে বেঁধে ফেলতে না রাজি হয়? যদি আবার দুর্যোগ-দুঃসময়ের দোহাই পাড়ে? তার এই কলঙ্কটাই তো সুজনের চোখে রূপবান হয়ে উঠেছে। সেই মোহটুকু যদি মুছে যায় জন্মের মত? সেবার বুকের ভিতরটা এতটুকু হয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে, যা নয় তাই দেখিয়ে, ঠকিয়ে, জোচ্চুরি করে বিয়েটা সে হাসিল করবে? এই কি ন্যায়? ক'দিন পরে সুজন যখন বুঝবে, এটা ধাপ্পা, তখন সে কী ভাববে তাকে? ভাববে না সমস্তই একটা আষাঢে গল্প, কাজ গুছোবার ফন্দি?

না, সব সে বলবে খোলাখুলি। কিন্তু যখুনি বলবে তখুনি তার ডাকের সাজ খসে পডবে। চিক্কন-চাকন ধুয়ে গিয়ে ভিতরের খড পডবে বেরিয়ে।

১০

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস থেকেই লোকজন অল্প-অল্প করে ফিরে আসতে সুরু করেছে। ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়ারা মুখ ঘুরিয়েছে এত দিনে। ট্যাক্সির ভাড়া আজ বেশি বলে ভাবতে সাহস হচ্ছে। প্রতিবাদ করবার মত গলায় জোর পাচ্ছে একটু। যত মাল নিয়ে গিয়েছিল তার অর্ধেকও নিয়ে আসতে পারেনি, ফেলে-ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে। সবাইরই মুখে দুর্ঘটনার ছাপ। ছেলে ডুবেছে জলে, মরেছে গাছ থেকে পড়ে, পড়েছে সাপে-কাটা। মেয়েটা গেছে টাইফয়েডে। কারু চুরি হয়ে গেছে সর্বস্ব। ইঁদুর জামা-কাপড় বিছানা-বালিশ কেটে তছনছ করে দিয়েছে। শেয়াল আর কোলা ব্যাঙ, কেন্নো আর শুঁয়োপোকা, জোনাকি আর ঝিঁ ঝিঁ—কোথায় গিয়েছিল তারা? কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল—কচা, কচুপাতা আর কচুরিপানার রাজ্য। পাখায় রঙের ছিট-ওয়ালা মশা চল্লিশ-ডিগ্রি কোণে সে ম্যালেরিয়ার হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে। কুইনিন নেই। কবরেজি পাচন খেতে হচ্ছে। কালা-জ্বর পালা-জ্বর জগকম্প জ্বর—জর্জর হয়ে গেছে। কাঁটালে মাছি, কুকুরে মাছি, ডাঁশ-মাছি, কাণামাছি—বেরিয়ে পড়েছে ঝাঁক বেঁধে। আর এত পোকাও ছিল—কুমরেপোকা, গুবরে পোকা, গাঁধিপোকা, ঘুর্ণিপোকা, তেলাপোকা আর ছারপোকা। ওলাউঠা, আমোশা, খোস-পাঁচড়া। একটা হাতুড়েও পাওয়া যায় না হাতের কাছে। ওষুধ-পত্র সব আলমারি ছেড়ে সিন্দুকে গিয়ে উঠেছে। জেরবার, নাজেহাল হয়ে গেছে সব। ফিরে আসছে নাকচ-নাকাল হয়ে। যারা পালায়নি তাদের নীরব ও নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে।

দোকানের ঝাঁপ উঠছে থেকে-থেকে। পানের দোকান, মনিহারি।

রাস্তার মোড়ে-মোড়ে আসছে কতক রিকশা-ওয়ালা। ঝাঁকামুটে। গয়লারা কেউ-কেউ টিনের বাঁক নিয়েছে কাঁধে করে, খেজুর-পাতা-ডোবানো চালানি দুধ। বাক্স-হাতে পরামানিক দেখা যাচ্ছে দু'-একজন। মুচিরা কেউ-কেউ পায়ের তলায় গরুর শিঙ চেপে ধরে সুঁচের মুখে মোম ঠুকরে-ঠুকরে জুতো সেলাই করছে। ভিখিরিরা জড়ো হয়ে উঠছে। পয়সার বদলে ভিক্ষে করছে ট্রামের কুপন।

বারিধিও এসেছে কলকাতায়। কলকাতাকে দেখতে। বালির বস্তায় জাঁতা ঠেকো-দেয়ালে মাথা-ঠোকা কলকাতা। আর সেবার খোঁজ করতে। শ্রীভূষণবাবুর কাছ থেকে কোনো হদিসই পাওয়া যায় নি। কথাই কমিয়ে ফেলেছেন। যেন কিছুই জানে না, এমনি অবাক হবার মত করে, জিগগেস করে এটুকু শুধু জেনেছে, মাসতুতো বোনের বিয়েতে গিয়েছে কলকাতা।

বারিধি অপদস্থ বোধ করছে নিজেকে। তার মনে হচ্ছে, সে সেবাকে প্রত্যাখ্যান করেনি, সেবাই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার পরামর্শ না নেওয়া, তার ছায়াতল থেকে রোদ্দুরে সরে যাওয়ার মানেই তাকে প্রত্যাখ্যান করা। তাকে প্রহার করা। গঙ্গায় ডুবে সেবা যদি আত্মহত্যাও করে তবু সে-জ্বালা ঠাণ্ডা হবার নয়।

হাতের ঢিল ছুঁড়লে ফের ফিরে আসে না জানি, তবু দেখবে সে চেষ্টা করে, সে-ঢিল সে কুড়িয়ে পায় কিনা।

'তোমার এখানে সেবা বলে কেউ এসেছিল? এই কুড়ি-একুশ বয়েস?'

'কেন বলো তো?' ডাক্তার সিংহ টনটনে কৌতূহলে জিগগেস করেন।

'হ্যাঁ, জানি সে আসবে। ঘুঘু মেয়ে, শেষ ধাপ পর্যন্ত না পৌঁছে সে ছাড়বে না।'

'কেন, হয়েছে কী?'

আর বোলো না। গাঁয়ে গিয়েছিলেন ইভাকুইয়ি হয়ে। আর যা হয়, শহুরে পাখনা দিলেন মেলে, মরবার আগে পিঁপড়ের যেমন পাখা গজায়। আর, জানো তো, শহুরে-গাঁয়ে ব্যাঙের ছাতার মত একদল অকেজো ছেলে উঠেছে, ঢালা ফরাসের যারা স্বপ্ন দেখে, ভাঙা স্বপ্নের পর রাঙা স্বপ্নের সান্ত্বনা, তাদেরই সঙ্গে, ওড়াউড়ি স্বরু করলেন। বাপটি একটি জাম্বুবান, অগামারা। আর মা-টি তো মেয়ের দেমাকেই ডগমগ। ফলে যা হবার তাই হল। আর, আমার কাচারির বগলেই তাদের বাসা। যেমন হয়, ছেলেটা অস্বীকার করেছে, পালিয়েছে পশ্চিমে। আর মেয়েটা দিশেহারার মত চলে এসেছে কলকাতা। তাকে ধরতে হবে, দাঁড় করিয়ে দিতে হবে, অপচয় বাড়তে দেয়া হবে না। নতুনতর সমাজের মূল্যে তাকে মূল্যবান করে তুলতে হবে। সংগঠন চাই, সমাজের সমস্ত বেমেরামত বনেদ-গাঁথুনির পিল-থামাল খিল-খিলেন মজবুত করে দিতে হবে।

'মেয়েটা বোকা।' ডাক্তারের এই যেন প্রকাণ্ড আপশোষ। প্রায় অভিযোগ।

'বোকা না হলে এমন ভাবে কেউ সর্বনাশ ঘটায়? কিন্তু যাই বলো, সর্বনাশ বলে কোনো কথা নেই আর আমাদের অভিধানে। এখন সর্বশুভ। একবার পা পিছলে পড়েছে বলে মেয়েটাকে চিরকাল খোঁড়া করে রাখতে হবে এ অনুশাসন উঠে গেছে।'

'মেয়েটার কিছুই হয় নি। বোকা ও সেইখানে।' ডাক্তার মৃদু-রেখায় হাসলেন। যেন নিজে বোকা বনেছেন সেই ভাব।

আরোগ্যের পুরস্কার রোগিণীর বন্ধুতা এই চিরকাল ঘটে এসেছে সিংহের জীবনে। গূঢ় মন্ত্রগুপ্তির প্রতিশ্রুতি শুধু তাঁরই সঙ্গে। তাঁর কাছে কিছু অজানা নেই, শুধু তাঁর কাছেই সে উন্মুক্ত, হাতে ছিল তাঁর

সেই বশীকরণের রহস্য। কিন্তু এই মেয়েটা তাঁকে ফাঁকি দিয়ে গেছে। ফাঁকি দিয়ে গেছে তার মুক্তির নির্মলতায়, মূর্খতার সারল্যে। শুধু তার জন্যেই তাঁর মায়া হয়েছে, জ্বালা হয়নি। তাই তার চলে যাবার সময় তিনি তাকে আশীর্বাদ করে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমার ভালো হোক, তুমি বিয়ে করো, রত্নপুত্রবতী হও।

'কিছুই নয় ?' বারিধি বসে পড়ল।

'বিন্দুবিসর্গও না। মেয়েটা শুধু বোকা নয়, এক বাণ্ডিল নত। কী নরকের মধ্যে অকারণে নাকানিচুবুনি খেয়েছে এত দিন।' ডাক্তারের স্বরে প্রায় সমবেদনা।

'তার ঠিকানা দিয়ে গেছে ?' নিঃস্বের মত শোনাল এবার বারিধিকে। মনে হল, ক্ষীণতম সম্পর্কের তন্তুটি এবার ছিঁড়ে গেল। আর কোনো দাবিতেই তাকে কাছে আনা যাবে না। মর্মে লেগে থাকবে না তার আর কোনো স্মৃতির সূচীমুখ। এই যুক্তিটা লাগল তাকে শেষ পরাভবের মত।

ডাক্তার ঠিকানা দিলেন। 'সত্যি ঠিকানা কিনা কে জানে ?'

না, সত্যি। নাম যখন সত্যি। মেয়েটা এত বোকা নিজের নাম আর ঠিকানাটাও ভাঁড়াতে পারেনি ? কিন্তু মূর্খ বলেই নিষ্কৃতি মেলে না তার প্রকৃতির হাত থেকে।

বারিধি উঠে পড়ল। ডাক্তার বললেন, 'যদি পাও, মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো তার বাপ-মায়ের হাতে। বিয়ে দিয়ে দিতে বোলো। যদি পার, কেনই বা পারবে না, তুমিও সাহায্য কোরো এ বিষয়ে। বড় ভালো মেয়ে, এমন মেয়ের সুপাত্রের অভাব হবে না। যে বিয়ে করবে সে রাজা হয়ে যাবে। সংসারকে সুন্দর করবার মন্ত্র জানা আছে তার।'

বারিধি জানে, কি করতে হবে। তখুনি সে বেরিয়ে পড়ল সন্ধানে। তার অনেক রকম বেশ আছে, পরলে কাবলিওয়ালার পোষাক।

ঠিক ঠিকানাই দিয়েছে দেখছি। এর মধ্যে বারিধি দেখতে পাচ্ছে যেন বিদ্রোহের ভঙ্গি, জয়ীর গাম্ভীর্য। তার মধ্যে কিছু আর গোপন করবার নেই, সে পরীক্ষোত্তীর্ণ, দণ্ডমুক্ত। তেজটা দগ্ধ করতে লাগল বারিধিকে। তারপর দূর থেকে যখন দেখল সে সেবাকে. বারান্দায় রোদ্দুরে হাতে-কাচা কার একটা শার্ট দিচ্ছে শুকোতে, তখন সে যেন ঠিক তার বুকের উপর প্রকাণ্ড ঘুষি খেল। দেখল, সেবার অন্য রকম চেহারা। সেই ঢলঢলে ভাব আর নেই, অনেক শক্ত, অনেক সমর্থ হয়ে উঠেছে। পেটাই-কুটাই হয়ে আঁট হয়ে গেছে সে গিঁটে-গিঁটে। যেন, ভাঙবে তবু মচকাবে না এই প্রতিজ্ঞায় সে ঋজু। পরনে মোটা ময়লা শাড়ি, সম্পূর্ণ খালি তার হাত-গলা, কপাল-সিঁথিও শূন্য। শাঁখা বা সিঁদুরেরও চিহ্ন নেই। মূর্তিমতী রিক্ততা। সামনে এগোবার ভরসা পেল না বারিধি। ভিতরে একাকী কোন পুরুষের উপস্থিতি।

গুপ্তচরের ভেক ধরে ঘুরতে লাগল সে আশে-পাশে, খাতা-পেন্সিল হাতে নিয়ে। কে কি কোথায়।

১১

আরো লোক আসছে ক্রমে-ক্রমে। ফ্যাকাসে, চোপসা মুখে আসছে ছেলেরা। ইস্কুল খুলবে এবার সুজনদের। যে-যে ক্লাশে ছেলে পাওয়া যায়, সে-সে ক্লাশ। সামনেই পুজার ছুটি, ছুটির পর পুরোপুরি খোলা যাবে আশা হচ্ছে। আগে শার্সির কাঁচে কাগজের ফালি লাগানো হয়েছিল, এখন সমূলে খুলে ফেলা হয়েছে। মাঝখানের হলটাকে করা হয়েছে প্রচ্ছন্ন কক্ষ।

মোটা চুরুট দাঁতে এঁটে হীরেন খাস্তগির খবরের কাগজ পড়ছেন। ধুলো-বালি ওড়ানো শুকনো খানিকটা শীতের হাওয়ার মত ঘরে ঢুকে পড়ল সুজন। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনি উদাসীন ভঙ্গিতে সম্ভাষণ করলেন হীরেনবাবু।

'কি মনে করে?'

'আমাকে নাকি ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেবেন?' সুজন বিমর্ষের মত কবে, না, বিদ্রোহীর মত, বুঝতে পারছে না।

'হ্যাঁ, কমিটির তাই মত।'

'আমার অপরাধ?'

বাঁকা চোখে তাকালেন হীরেনবাবু। 'সত্যি, জানো না কি অপরাধ?'

'কি করে জানব। বলুন, শুনি।'

'তুমি একটা মেয়েকে নিয়ে আছ এক বাড়িতে।'

'এক বাড়িতে থাকব না তো যাব কোথায়? তাকে আমি বিয়ে করেছি।'

'বিয়ে করেছ ?' ঠাট্টায় কুঞ্চিত হল তাঁর ঠোঁট।

'হ্যাঁ, বিয়ে করেছি। রেজেস্টি্র করে। দেখবেন সে দলিল ?'

'দরকার নেই। দলিল-টলিল আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু, বি'য় করেছ যে, তার চিহ্ন কই ? কই মেয়েটার সিঁদুর আর শাঁখা ?'

এ খবরও পৌঁচেছে তাঁর কাছে ? স্বজন ঢোক গিলল, বলল, 'আমি মানি না ও-সব চিহ্ন, দাসত্বের চিমটে পুড়িয়ে হাতে-কপালে সেই ছেঁকার দাগ। 'আমি পুরুষ, আর সে মেয়ে—এর বাইরে আমাদের অন্য কোনো পরিচয় নেই। আমরা মানুষ—এর বাইরে নেই আমাদের কোনো সমাজ। আর, তার হাত-গলা খালি দেখতে না চান, আশীর্বাদ বাবদ দিন না কিছু সোনা-দানা।'

হীরেন খাস্তগিরের অভিজাত সংস্কার, তাঁর মিরাশকায়েমী স্বত্ব, সেই তাঁর ধর্ম ও সমাজ, যার উপরে তাঁর এই ঐশ্বর্যের বনেদ—সমস্ত যেন আমূল ঝাঁকুনি খেল। তবু তিনি কণ্ঠ নিরুত্তেজ রাখলেন. 'কিন্তু মেয়েটা খারাপ।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল স্বজন। বললে, 'কি করে জানলেন আপনি ?'

'আমারও দলিল আছে, ডাক্তারের প্রেসক্রপশন।'

'মিথ্যে কথা। খারাপ আপনি কাকে বলেন আপনিই জানেন। যে লোক উদ্বৃত্তের অধিকারী হয়েও প্রতিবেশীকে উপবাসী দেখে উপহাস করে তার চেয়ে আর কে খারাপ হতে পারি জানি না। কিন্তু হলই বা সে খারাপ। যে খারাপ তাকে চিরকালই খারাপ রাখার যে ব্যবস্থা চলছে সমাজে, তা বদলাতে চাই। যে খারাপ তাকে ভাল হবার সুযোগ দেব না ? যে চোখ বুজে আছে অন্ধকারে, তাকে দেখতে দেব না পৃথিবী ?'

ব্যঙ্গময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে হীরেনবাবু বললেন, 'শুনতে তো ভালই লাগে। কিন্তু কথা তা নিয়ে নয়—'

'যাই নিয়ে হোক, আমি তো তাকে বিয়ে করেছি। মানলাম সে খারাপ, কিন্তু বিয়েটা আপনি ভাল বলে মানবেন না?'

'আমার কথায় কি এসে যায়? তোমার পাঁঠা তুমি ল্যাজে কাট কি ঘাড়ে কাট তাতে আমার কি মাথাব্যথা? কিন্তু কথা হচ্ছে, ছেলেরা কথা কইবে—'

সুজন জড়বুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে তারা আলোচনা করবে, তোমার কীর্তির প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠবে। সেটা তাদের মনের উপর ভাল কাজ করবে না। শিক্ষকের চরিত্র খারাপ হতে পারে, সত্য হোক মিথ্যে হোক, এমন একটা দৃষ্টান্ত কিছুতেই রাখতে দেয়া হবে না তাদের সামনে।' উদ্গীর্ণ ধোঁয়ার আরামে হীরেনবাবু চেয়ারের পিঠে হেলে পড়লেন।

'কিন্তু চাকরি গেলে আমি খাব কি?'

বড় মধুময় শোনাল যেন এই কাতর আর্তস্বরটা। তাঁর টাকার ঝনঝনানিতে রাত্রিদিন এই কান্নাটাই শুনছেন, খাব কি? শুনতে-শুনতে কানের পোকা বেরিয়ে গেছে সব। আর, এ শুনতে না পেলেই যেন অশান্তি লাগে।

'বা, চুপ করে থাকবেন না, উত্তর দিন।' কই প্রার্থনার ভঙ্গিতে নুয়ে পড়বে, উলটে এখনো কিনা দাবি জানায়। ভাবখানা এমন, সমস্ত দায়দায় যেন হীরেন খাস্তগিরের জিম্মায়। 'বা, চাকরি যেমন নিয়েছেন একটা, তেমনি আরেকটার ব্যবস্থা করে দিন।'

'তার আমি কি জানি।'

'অমন মোলায়েম করে বললেই চরম কথাটা বলা হল না। দিতে যখন পারেন না, তখন নেন কেন ছিনিয়ে?' সুজন থামল, কথার মাঝে হঠাৎ শোনা গেল কি একটু জোলো কাতরোক্তি? শোনাক, তবু সেবা, হ্যাঁ, সেবার কথা ভেবেই সে বললে, 'ইচ্ছে করলেই, যখন অন্য জায়গায়

ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তখন মিছিমিছি কেন আমাদের উপবাসী রাখবেন ?

'যুদ্ধে যাও।'

'তাই যাব।'

দ্রুত দৃঢ় উত্তরে হীরেনবাবু চমকে তাকালেন একবার সুজনের চোখের দিকে।

'কে জানে, হয়তো তা আপনার বিরুদ্ধে। দু ভাগে তাই ভাগ হয়ে গেছে পৃথিবী। এক দিকে লোভ আর স্বার্থ আর সঞ্চয় আরেক দিকে—

হীরেনবাবু উঁচু গলায় হেসে উঠলেন : 'বোলো না, কালনেমি অনেক আগেই লঙ্কা ভাগ করে রেখেছিল।'

'পুরশ্রী কোথায় ?' সুজন হঠাৎ গম্ভীর গলায় জিগগেস করল।

ততোধিক গম্ভীর হল হীরেনবাবুর মুখ 'তাকে কেন ?'

'তিনি দেখতেন এই অবিচারটা।'

'এর চেয়ে ঢের বেশি সে দেখেছে। একটা যে বটগাছ, আরেকটা যে ভেরেণ্ডা, এটাই তার কাছে প্রকাণ্ড অবিচার। ক্লাশের পরীক্ষায় একটা ছেলে যে ফার্স্ট হবে আরেকটা যে পাশ করতে পারবে না এটা তার মর্মশূল। হাতের আঙুল পাঁচটা সমান নয় বলে আঙুলের মাথা ঘসছে সে দেয়ালে। তার কথা আর বোলো না।' হীরেনবাবু অন্যমনস্কের মতো খবরের কাগজকে এ-পিঠ ও-পিঠ করতে লাগলেন।

সুজন রাস্তায় নেমে এল। খুব অবসন্ন মনে করতে দিল না নিজেকে পথ ঘাট সব অন্ধকার মনে হতে লাগল তবু মনের মধ্যে জেলে রাখবে সে আগুন যা তাকে আলো দেবে, তাপ দেবে আমরণ।

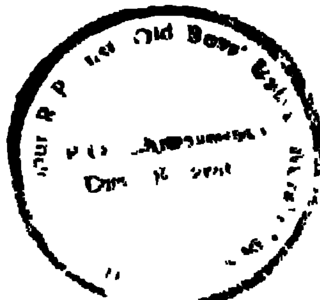
তাই সেবাকেও সে হা-হুতাশ করতে দিল না। বললে, 'ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে নুয়ে পড়াটাই আমাদের হার হবে। আমরা লড়ব। মরবার আগেই মরব কেন ? আমাদের বেঁচে থাকাটাই যে ওদেরকে উপহাস

করা। আমরা মরে গেলে, মরে গেলেই যে ওদের শান্তি। তা আমরা হতে দেব কেন? মাটি কামড়েও বেঁচে থাকব আমরা।'

পচা, নোনা-ধরা, পুতিয়ে-ফেলে-দেয়া তার জীবনটাকে আজ বড় বেশি মূল্যবান বলে মনে হল সেবার। মনে হল তার অসীম ক্ষমতা, অনেক দায়িত্ব। তার বাড়ির চৌকাঠ এই ইটকাঠের অনেক বাইরে চলে গেছে। অনেক বেড়ে গেছে তার হুদ্দা-চৌহদ্দি।

'তার পর তুমি আমার পাশে।' সুজন সেবার হাত ধরল, মুঠ করে চেপে।

সে শুধু স্ত্রী নয়, সঙ্গিনী, সহচরী। গৃহশোভা নয়। পার্শ্বচারিণী পথসাথী। দাঁড়ের ময়না নয়, শিকরে বাজ।



১২

আশ্বিনে ঝড উঠল। আর, জল উঠল। কালো ঝড় আর ঘোলা জল। একের সঙ্গে আর পাল্লা দিয়ে চলেছে।

একটু কালো-কালো মেঘ, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া, একটু-বা জলের কুলকুল। কিন্তু চক্ষের পলকে এ কি চেহারা নিল! ঝড়ের ভয়ে সবাই ঘরে দোর এঁটে রইল, আর দোরে অমনি পড়ল জলের করাঘাত। গাছ পড়তে লাগল মডমড করে, জল উঠতে লাগল হুহুশ্বাসে। দিগম্বর হয়ে দানবের দল তিন ভুবন জুড়ে দাপাদাপি সুরু করেছে। দীঘা ও জলপুট ছেড়ে সমুদ্র ঢুকে পড়েছে ভিতরে, আদিগন্ত মুখব্যাদান করে। বালিয়াড়ি তলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। হামলাতে লাগল গরু, ঘেউতে লাগল কুকুর। অন্ধকারে মুরগির ডাক। গাছহারা পাখির কচকচি। আর মানুষের বা আর্তনাদ তা তলিয়ে গেল জবরদস্ত জলের গর্জনে। গরু-ভেড়ার সঙ্গে ভেসে যেতে লাগল মা-মেয়ে ছেলে-বউ আণ্ডা-বাচ্চা। নেচে-নেচে কচুরিপানা, ভোলো ঘাস, চেলাফুল। মাছ যে মাছ সে পর্যন্ত আর জলজীয়ন্ত নেই।

যেমন আদাড়ে কচু তেমনি বাগাটে তেঁতুল। এই কাঙালী শেখ আর হৈবতুল্লা। মালি-মামলা লেগেই আছে দু'জনে মধ্যে। ফৌজদারির পর দেওয়ানি। এ ওর বাঁশের এঁটে কেটে নিয়েছে, ও এর কলার তেউর। এ ওর কেটে দিয়েছে চালের বাতা, ও ওর বেড়ার বাঁখারি। নিত্যি আখেজ, নিত্যি আখোটি। এ ওর কলাই ভাঙে ও এর মুগুরি খাওয়ায়। তার পর হক-হকিয়তের মামলা। এর গরু ওর হারাম। এ যদি কলাপাতায় এমনি করে খায়, ও খাবে অমনি করে।

সেই দুই চিরশত্রু আজ একই খোড়ো চালে আশ্রয় নিয়ে ভেসে চলেছে। ক'টা মুরগি আর একটা মিনি বেড়াল। আজ একই বন্যা কাঙালী আর হৈবতুল্লাকে একই পারের আশায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সে বন্যা ওদের ভিতরকার সমস্ত মেকি বিরোধ ধুয়ে দিয়ে নিয়ে চলেছে একই বন্ধুতায়।

কাঙালী বলেছে, 'ভাইরে।'

'ভাইরে।' হৈবতুল্লা প্রতিধ্বনি করেছে।

ওদের কণ্ঠে সমান হাহাকার, একই মানুষের ভাষায় লেখা।

'আর কাউকে নিয়ে আসতে পারলাম না, চেয়ে ছাখ, হাতে করে নিয়ে এসেছি শুধু খেলো হুঁকোটা।' হৈবতুল্লা হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল।

কাঙালীর মুখেও সেই উদ্বেলিত কান্না 'শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ছিলাম মেয়েটাকে। টেনে তোলবার সময় ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। চেয়ে ছাখ আমার হাতে তার সেই কোমরের ঘুনসি।'

কাঁসাই-ক্ষীরাই রূপনারান আর রসুলপুর—সব খেপে গেছে। কোথাও একখানা নৌকো দেখা যাচ্ছে না। যারা চাল খুলে নিতে পেরেছে, শোয়ার মাচা, দরজার ঝাঁপ—তাতেই ভেসে চলেছে তারা। যে গাছ পড়েনি এখনো তাকেই আঁকড়ে আছে জোঁকের মত। কোন ডালটা আগে ভেঙে পড়ে তারই আতঙ্কে। আর সব জলযাত্রা করেছে, সারি-সারি, কাতারে-কাতারে।

কাঙালী আর হৈবতুল্লা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, আর ভাবে একই ভাবনার পাশাপাশি বসে, কোথায় তাদের জমি-জায়গা, হাল-গরু, খলেন-খামার। কোথায় সেই বাঁশের এঁটে, কলার তেউর। তাদের জরু-বেটি, ছেলে-ছাবাল। কোথায় সব? একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা খোঁজে। তারা এক সর্বনাশের হিশ্যাদার।

পুরশ্রী দেখা করতে এসেছিল সুজনের কাছে।

সুজন আরেকখানা ঘর চেয়ে নিয়েছিল বাড়িওয়ালার কাছ থেকে। 'বসুন আমার ড্রয়িং রুমে।' বলে সুজন মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দিল। 'মসলন্দে না বসলে মসনদে বসতে পারবেন না।'

হাঁটু মুড়ে বসল পুরশ্রী। বলল, 'একটু ব্যস্ত আছেন মনে হচ্ছে।'

'সামান্য। বাসা-বদল করছি।'

'কেন ?'

'বাড়িওলা শাঁসালো কোন এক ভাড়াটে পেয়েছেন। নাম বারিধি মজুমদার। চেনেন নাকি ?'

'বাবার কাছে আসতে দেখেছি ভদ্রলোককে। শুনেছি পার্টির লোক। কপিল মুখুজ্জের বাড়িতে আলাপও হল সেদিন। গ্রামে নাকি খুব ভাল কাজ করছেন। তা, এখন যাচ্ছেন কোথায় ?'

'একটা বারোদুয়ারী ব্যারেকের খুপরিতে। ভাড় না দিয়ে ছিলাম একটু স্বস্তিতে, তা সইল না কারুর।'

'আমিও বাড়ি ছেড়েছি।'

'কই, শুনিনি তো।'

'হ্যাঁ, আছি একটা মেয়েদের হসটেলে। সব বাজে, বোকা মেয়ে; সাজগোজ, সিনেমা, চিঠি-লেখালেখি। ভাল লাগে না। আচ্ছা আপনার ঐ ব্যারাকে আমার জন্যে একটা ঘর নিতে পারেন ?'

কি রকম যেন ক্লান্ত শোনাচ্ছে পুরশ্রীকে। দেখাচ্ছে আরো রুক্ষ, অ[illegible] প্রতিজ্ঞাতীক্ষ্ন।

নিজের স্বর শুনে নিজেই একটু চমকে উঠেছিল পুরশ্রী, তাই তাড়াতাড়ি মুখে হাসি এনে প্রশ্ন করলে শাদা গলায়, 'আর কি করছেন ?'

'বা, বললাম যে বাসা-বদল করছি। বাসা-বদল শুনতেই আপনার

রোমাঞ্চ হয় না? নতুন খাতা-মহরৎ শুনলে বুক কেঁপে ওঠে না আপনার?'

'আরো অনেক কিছুতেই কেঁপে ওঠে। কিন্তু কাজ কি করছেন?'

'আপনি কিন্তু আমাকে আর ইস্কুল-মাস্টার বলে ঠাট্টা করতে পারবেন না।'

লজ্জিত বিনয়ে হাসল পুরশ্রী। 'তা জানি। তারপর পেয়েছেন কোনো কাজ?'

'ভেবেছিলাম পাব না। কিন্তু একান্তই মরব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই পেয়ে গেছি একটা। মাড়োয়ারির গদিতে বাঙালী কেরানি। খোকড় রাখি আর গুদাম থেকে মাল খালাস দিই। মোটে চল্লিশ টাকা মাইনে। তা ছাড়া এখন আবার বাড়ি-ভাড়া লাগবে। তবে যদি মাড়োয়ারির আড়ত থেকে কিছু চাল-ডাল সরাতে পারি, তা হলেই বেঁচে যাই।'

'তা হলে এখন আপনাকে গদিয়ান বলব?'

'বেনে-মুদি বলুন, মানে থাকবে। তার উপর, শুনেছেন কিনা জানি না, বিয়ে করেছি।'

পুলকের ছিলাটা যেন ছিঁড়ে গেল। 'হঠাৎ?'

'পাকেচক্রে ঘটে গেল বিয়েটা। এই যে সেবা।' ভিজে হাত আঁচলে মুছতে-মুছতে সেবা চলে এল ঘরের মধ্যে।

'এ পুরশ্রী।'

পুরশ্রী যেন তাকিয়েও তাকাল না। তাচ্ছিল্য করল। ভাবল, আজেবাজে। সেই ঝাঁকের কই।

বলল, 'আপনারো তা হলে আয়নার দরকার হল?'

'আয়না? আয়না কোথায়?' খোঁচাটা বুঝতে পারেনি সুজন। 'সেবা তো বাটির জলে মুখ দেখে সিঁথি কাটে।'

'আর আপনি আপনার বউয়ের মুখে নিজেকে দেখেন। তার জন্যেই তো বিয়ে। যাতে পুরুষ নিজেকে ডবলসাইজ করে দেখতে পারে। এমনিতে কেউকেটা, আর স্ত্রীর কাছে মহাবীর।' পূরশ্রী উঠে পড়ল।

'মন্দ কি। চল্লিশ টাকাটা যদি স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে আশি টাকা ভাবতে পারি তা হলে তো কিস্তি মাত করে দিলাম। এ কি, এখুনি চললেন যে? কেনই বা এলেন আর কেনই বা চলে যাচ্ছেন—'

পূরশ্রী দাঁড়াল। সত্যি, কেমন ছন্দপাতের মত দেখাচ্ছে। বললে, 'আমি যাচ্ছি এখন বন্যার রিলিফে। ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় বেকার আছেন, নিয়ে যাব সঙ্গে করে। কিন্তু এসে দেখছি,' এখানে পূরশ্রী হাসল, 'আপনি গদি ছেড়ে হাওদায় এসে বসেছেন।

মৃত্যুর কথা কে মনে রাখছে। সেই মৃত্যুর পাহাড়। আপাদমা জোয়ান ছিল কাঙালী আর হৈবতুল্লা, এখন ঘুন-ধরা বাঁশের মত ঝাঁজরা হয়ে গেছে। শুয়ে আছে হাঁসপাতালের সামনে। ভিতরে জায়গা নেই। দুটি বিদেশিনী সেবিকা পলতে করে মুখের কষ দিয়ে দুধ খাইয়ে দিচ্ছে।

কোথায় সেই জল। এখন শুধু গরুর হাড়, মানুষের কঙ্কাল, আর দুর্গন্ধ। আর শকুনের পাখসাট।

১৩

এত জলেও বারিধি ধুয়ে নিতে পারল না নিজেকে। এসেছিল সে বন্যার মশানে, দুর্গতচর্যায়। গঠন ও চালনা করল অনেক সেবাসৈন্য, নৌকোয় করে বস্তা-বস্তা চাল, গাঁটরি-গাঁটরি কাপড়। গুঁড়োনো শুকনো দুধ, শটি-বার্লি, ওষুধ-পত্র। আকাঙ্ক্ষার বাইরে যে চলে গিয়েছে তার জন্যে ভাত, মৃত্যুর চেয়েও নির্লজ্জ যে লজ্জা তার জন্যে আবরণ। বাতাস একটু হালকা করে দাও এই শবগন্ধের স্পর্শ থেকে, স্তব্ধীকৃত আর্তনাদের ভার থেকে। খোড়ো চালের ঘর তুলে দাও এক-আধখানা। চাষবের জন্যে বীজধান দাও অন্তত দু' কাঠি করে। নোনা জমি আবার মিঠেন করে তোলো। জমিতে জোর আনো ফিরিয়ে।

কিন্তু কিছুতেই বারিধি শান্তি পায় না। মাঝে-মাঝে একটা উজ্জ্বল উত্তেজনা আসে মাত্র, কিন্তু তৃপ্তির তাপ লেগে থাকে না। ধিক্কার ধরে যায়। এমন মহান যে দেশের কাজ তা দিয়েও সে নিজেকে মেজে-মেজে নির্মল করতে পারে না কেন? কেন সমস্ত পবিত্র ব্রতকার্যের মাঝেও একটা আবিল কৌতূহল তাকে অন্যমনস্ক করে রাখে? কেন কৃত্রিম কৃচ্ছ্র দিয়েও শুকিয়ে মারতে পারে না সে সেই ক্লিন্ন কৌতূহলকে? কেন সুসমস্ত একটি লিপ্সা তার রক্তকে ঘুমুতে দেয় না?

এই যে দলে-দলে নিঃস্বার্থ ছেলে-মেয়ে কাজ করছে, মৃত্যু ও পূতিগন্ধের মাঝে, এত ক্লেশ আর অমর্যাদা সয়ে, কে জোগাচ্ছে তাদের প্রেরণা? শুধুই কি হুজুক, আত্মাদর, নামের মত্ততা? জানে না বারিধি। সে শুধু নিজেকে জানে। চিরে-চিরে দেখে নিজেকে।

এ তার একটা ভ্রম, নিজেকে দয়া করতে ইচ্ছে হয় এই বলে। নিজেরই কাছে ফের সায় পায় না। ভাবে, তার জীবনে সত্যিই দুঃখ নেমে আসুক, অবিচ্ছিন্ন কালো রাত্রির মত, কিম্বা আশ্চর্য কোনো প্রেম, সমুদ্রের উপর সূর্যের আবির্ভাব। সময়ের হাতে ছেড়ে দেয় নিজেকে, যদি পার পায় এই গলিত মাংস ও অঙ্গারিত অস্থি থেকে। যদি পায় তার নিজের দেশ, নিজের পরিধি।

কিন্তু পথের পাশে চুপ করে বসে থাকলেই কি সে আসবে?

গলি চিনে দুপুরেই সে হাজির হল সেবাদের ব্যারাকের বাড়িতে। দরজা খুলে তাকিয়ে দেখেই সেবা একেবারে থ হয়ে গেল। এত বড় নির্লজ্জতা সে কল্পনা করতে পারত না।

'তোমার জন্যে আরো কিছু টাকা নিয়ে এসেছি।' বারিধি অম্লানমুখে বললে, 'নাও।'

টাকা! কথাটা মনে হল যেন কোন প্রিয়তম আত্মীয়ের নাম। অনেক দিনের না-শোনা। যেখান থেকে হোক, যার হাত থেকে হোক, টাকা টাকাই। সুজন প্রশ্নও করবে না, ছাত ফুঁড়ে পড়ল নাকি মাটিতে। টাকায় কোনো নাম লেখা নেই, আমার-তোমার নেই। যখন যার তখন তার। টাকা সকলের।

'আপনি কি আমার কাছে ধারেন যে শোধ দিতে এসেছেন?' সেবা দরজার এ-পিঠ থেকে বললে।

'না, তা নয়।' বারিধি যেন মার খেল। 'তবে, কষ্টে পড়েছ, টাকাটা দিয়ে যদি কিছু সুবিধে হয় তো মন্দ কি।'

'কষ্টে পড়েছি আপনাকে কে বললে?' সেবা ভঙ্গিতে গরিমা আনবার চেষ্টা করল।

নিজেরই কাছে কথাটা ব্যঙ্গের মত শোনাল। কষ্টের ইতি-অন্ত কোথায়। দেশ থেকে শ্বশুর-শাশুড়ি চলে এসেছেন, শ্বশুর ধুঁকছেন

হাঁপানিতে আর শাশুড়ি শোকে,—সুজনের পরের ভাইটি মারা গেছে বসন্ত হয়ে। ঝি-চাকর রাখবার সাধ্য নেই, ধোপাবাড়ি অনেক দূরে চলে গিয়েছে। বায়ুহীন অন্ধকার ঘরে গুনে-গুনে নিশ্বাস ফেলছে তারা। সুজনের ঘুসঘুসে জ্বর আর তার ম্যালেরিয়া। না, তবু কাকে কষ্ট বলে?

'মনে তোমার যত সুখই থাক, শরীরের কষ্টটাই কষ্ট।'

আবার সেই শরীরই বুঝি উল্লিখিত হল এই পাণ্ডুর কৃশতায়, এই অপরিচ্ছন্ন দারিদ্র্যে?

'আমাদের চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট আছে সংসারে—' সেবা নির্দয়ের মত বললে।

'তা কি আমি জানি না?'

'জানেন তো, তাদেরকে আত্মীয় ভাবুন, দানে অনেক আনন্দ পাবেন।'

'আর যাকে আত্মীয় ভাবতে হয় না—'

যেন এ কথাটা সেবাকেই উদ্দেশ করে বলা। মানে, যাকে ভাবতে হয় না, যে আপনা থেকেই হয়ে আছে আত্মীয়। যেন অনেক অন্তরঙ্গতার স্বাক্ষর সে বহন করছে, অনেক সুদূর পরিচিতির। রক্তের চেয়েও গূঢ় ও গাঢ় যার সঙ্গে সম্বন্ধ। শত অস্বীকার সত্ত্বেও যে অঙ্গীকৃত, হয়তো অঙ্গীভূত।

মানেটা ঘুরিয়ে দিল সেবা। বললে, 'তাকেও আনন্দ পেতে দেবেন নিশ্চয়ই।'

বারিধি বিমূঢ়ের মত কথাটার পুনরাবৃত্তি করল, 'নিশ্চয়ই।'

'আপনি দাতার মত দেবেন পরকে প্রার্থী ভেবে তাতে তার আনন্দ নেই, অপমান। তার আনন্দ, যখন আপনার দেবার মত থাকবে না কিছু অহংকার।'

'দিয়ে-দিয়ে যদি ফুরিয়ে ফেলতে না পারি, তবে কেড়ে নাও

আমার থেকে। সত্যি, দাও না আমাকে শূন্য করে।' বারিধি হঠাৎ দু' হাত প্রসারিত করে দিল।

ব্যাকুলতায় নয়, কাতরতায়। কিন্তু কে জানে এ হয়তো নতুন ছল পাতা। নতুন সিঁদ কাটার সুলুক-সন্ধান।

'তার চেয়ে আপনিই আরো অনেককে শূন্য করতে পারবেন—' সেবা দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বারিধির মুখে কী দেখে থমকে গেল।

'আমাকে একটু বসতে দেবে ভিতরে? ক'দিন ধরে আমার হার্টটা ঠিক তাল মেপে চলতে পারছে না। একটু এখন বিশ্রাম না পেলে হয়তো—'

'মাপ করবেন। আমি জীবানন্দের ষোড়শী নই যে আপনার পিত্ত-শূলে মাত্রা মেপে মরফিয়া দেব খাইয়ে। অসুখ হয়ে থাকে, হাসপাতালে চলে যান। ঢের লোক হাঁসপাতালে পৌঁছুবার আগেই রাস্তায় মরে হুমড়ি খেয়ে।'

উজ্জ্বলন্ত নিষ্ঠুরতা। মুগ্ধের মত চেয়ে থাকে বারিধি। যা ক্লিষ্ট ও পাণ্ডু তা যে এত সুধান্বিত হতে পারে তা সে ভাবতেও পারত না। দারিদ্র্য ও রুগ্নতা যে হতে পারে এত দীপ্তকীর্তি, এ নিজের চোখে দেখেও তার অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। বারিধি অমীমাংসিতের মতো চেয়ে রইল। বললে, 'দুঃখ তোমার অনেক, কিন্তু, বিশ্বাস তুমি করবে না, তবু বলছি, বিশ্বাস করো, আমার দুঃখও কম নয়।'

'আপনার দুঃখ? সে-দুঃখ মেটাতে আপনার দুঃখ কি?'

'কিন্তু তোমার দুঃখ থাকলে—'

'থাক, আমার দুঃখমোচনের দায় আর আপনার না নিলেও চলবে। আগুনের দাহ আছে তাই শুধু জানেন, কিন্তু তার পবিত্রতাও আছে, সেটা আজ জেনে যান।'

'সেটা আজ দেখে গেলাম। আমাকে দেবে সে একটু আগুন?'

'ধরবেন যে, সে-আগুনের পাত্র কই আপনার জীবনে ?'

সেবা দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরে থেকে শোনা গেল বারিধির স্বর : 'কিন্তু, কিন্তু এক গ্লাশ জল দিতে পার খেতে ?'

দরজাটা বন্ধ করে দিতে-দিতে সেবা বললে, 'না, পারি না। পিপাসা যেন চিরকাল আপনার মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে, এই আমি চাই।'

বারিধি নেমে গেল আস্তে-আস্তে, প্রতি পায়ে পরের সিঁড়িটা অন্ধকারে অনুভব করতে-করতে।

সবল সফরীর মত ছিল, এখন যেন হয়েছে অগাধ জলের মাছ। গ্রীষ্মমণ্ডল থেকে চলে এসেছে মন্দোষ্ণমণ্ডলে। কমলকোমল ভাব ছেড়ে এখন সে হয়েছে রুক্ষ, শক্ত, অচিক্কণ। এত দিনে ব্যক্তিত্ব তার ছাঁদ বেঁধেছে। সে আজ আর কুলংকষা নয়, সে আজ মানস-সরোবর। আজই বুঝি সে ধ্যানের ও সন্ধানের।

সত্যি, তাকে বারিধি ফিরিয়ে নিতে এসেছিল, তার প্রথম-পরম অধিকারে। কিন্তু এসে দেখল, অনেক দূরে সংস্কারের শিকড় পাঠিয়ে দিয়ে সে কৃতজ্ঞতার নিশ্চিন্ত বৃন্তে শুভ্র-শুচি দুঃখের ফুল হয়ে ফুটে আছে। আর যেন তাকে ছেঁড়া যাবে না, ছোঁয়া যাবে না এমনি এক তীক্ষ্ণতা। সে এখন অনেক দূর-দুর্গম এমনি এক নির্জন নিবৃত্তি।

বারিধির পিপাসা না মরুক, কিন্তু সেবারও দুঃখ যেন না শেষ হয়।

১৪

'তোমার ভয় করছে, সেবা ?'

'একটু-একটু করছে।' সুজনের বাহু আঁকড়ে মুখ গুজে আছে সেবা।

'কিছু ভয় নেই। আমরাও যদি মরি, ভাবী কাল, ভবিষ্যমান পৃথিবীকে ওরা মারতে পারবে না।'

চাঁদ ছাড়া কেউ নেই আর বাইরে, পাথরের মত শাদা একটা স্তব্ধতা যেন আকাশ আর পৃথিবীর ফাঁকটা বুজিয়ে দিয়েছে। একটা কাক ঘুম-ভাঙা ভয়-পাওয়া গলায় থেকে-থেকে কা-কা করে উঠছে। শোনা যাচ্ছে ঝাঁক-বাঁধা কতগুলি ভ্রমরের গুঞ্জন।

এই খোলা আকাশ এক দিন মানুষের কত বড় আশ্রয় ছিল, কত বড় মুক্তি। যখনই মানুষ ভুলতে চেয়েছে তার ক্ষুদ্রতাকে, এই আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ সে আকাশ-প্রত্যাখ্যাত। আজ আকাশ তাকে ক্ষুদ্রাকার করে পাঠিয়ে দিয়েছে গুহার অন্তরালে। সেই তার বর্বর আদিমতায়। আজ তার আকাশপ্রদীপ গিয়েছে নিবে। আকাশ-কুসুমের দিন হয়েছে অস্তমিত।

তবু ভেঙে যাক এই খোপদস্ত জীবন। জীবনের যা কিছু ঠুনকো আর মেকি, বাজে আর ভেজাল, জলো আর জ্যালজেলে। যত ঢং আর ঢামালি। যত নেকাপনা আর ন্যাতনেতে ভাব। সাজগোজ আর গোছগাছ। যত কাপট্যের পারিপাট্য। আঞ্জাম-সরঞ্জাম। যত জাল-জোচ্চুরি। দাদন-মহাজনি। রিষ-বিষ। হামলা-হামলি।

থাকবে না আর বেছপ্পর আর বেএক্তিয়ার, বেকার আর বেইজ্জত।

ফিকিরে যারা ফকির সেজেছিল, সব আজ বেগতিক। এসেছে আজ গালহুমারের দিন। অবর রাত্রির অবসান।

'আমরাই বা মরব কেন?' বললে সেবা, অন্ধকারে চোখ মেলে।

'আমরাই বা মরব কেন?' মন্ত্রের উচ্চারণের মত সুজন পুনরুক্তি করল। 'আমরা জয়ী হব। বর্বরতার উপর বড় হবে আমাদের মিত্রতা। আর সেই মিত্রতা থেকেই তৈরি হবে নতুন পৃথিবীর মানচিত্র। যারা নিজেদের চিরকাল বেদখল ভেবেছিল, দেখবে, তারাই কখন বেদখল হয়ে গেছে।'

আবার সুরু হল একটা হুড়দঙ্গল। হুজুকপেয়ারা লোকের গুজব রটানো। আবার দশ দিকে পালাতে লাগল লোক—এবার বেশির ভাগ নিম্নবিত্ত। যারা স্রোতের শ্যাওলার মত এসেছিল ভেসে, চলে যেতে লাগল খড়কুটোর মত। যাদের ঘর-বাড়ি নেই, আশ্রয়-আচ্ছাদন নেই, ঘরপোড়ার কাঠও যাদের জুটবে না। ভদ্রলোকেরা এবার নড়ল না, ঠেকে অনেক শিখেছে তারা, দুমড়ে-মুচড়ে ঠেকা-ঠোক্কর খেয়ে তারা ধাতস্থ হয়েছে খানিক। বুঝেছে ঠেলার নামই বাবাজী নয়। বুঝেছে, সকল নুড়িই শালগ্রাম হয় না। তাদের বল-ভরসা বেড়ে গেছে অনেক। বুঝেছে, বিষ নেই, আছে শুধু কুলোপানা চক্র।

তারপর, যাবে কোথায়? ট্রেন কই? আগের এক হাত জায়গা এখন এক বিঘতের চেয়েও কম। তারপর সেই আধিব্যাধি। এবার আবার খাদ্যাভাব। একে রাম রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব তার মিতা। সবংশে নিধন তবে এবার অনিবার্য।

না, নড়ল না তারা। বুঝে নিয়েছে এক অনিশ্চয়তা থেকে আরেক অনিশ্চয়তা কম ভয়ংকর নয়। মৃত্যুর দ্বার একটাই শুধু খোলা নেই সংসারে। যে রাস্তায় তাকে কেউ দেখবেও ভাবেনি সেই রাস্তায় হঠাৎ এসে সে থাবা মেরেছে। একেবারে দিনে ডাকাতির মত।

না, নড়বে না তারা। তাদের অসহায়তাই তাদের সাহস, তাদের নিরীহতাই তাদের শাস্তি।

কিন্তু বাজারে হঠাৎ চালে টান ধরে। কত ধানে কত চাল কেউ জানে না। কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজে তাদের কাজ কি? কিন্তু হু-হু করে চালের দাম কুড়ি টাকায় উঠেছে। কুড়ি টাকা! দেখতে-দেখতে চল্লিশ। ধানের রাজধানী যে বাঙলা দেশ সেখানে কিনা চল্লিশ টাকা করে চাল! কে কবে শুনেছে জন্ম-বয়সে!

ধনন্দা যাদের দেবী এমন বহু ভাগ্যবান পাটাবুক হয়ে ঘুরে বেড়ায় কলকাতায়। চাষার গোলাজাত ধান শূন্য করে এনে গুদামজাত করে। যার যত বড় খুতি তার তত বড় মরাই। যার যত বড় জিভ তার তত বেশি লোভ। উদ্বৃত্তির অহংকারে প্রতিবেশীকে উপহাস করার প্রতিযোগিতা। অল্প কত জনের কত বেশি আর অসংখ্য অগণনের কত কম—চলে শুধু তারই উলঙ্গ উদ্ঘাটন।

'চাল ফুরিয়ে এল।' বললে সেবা, সুজনের মুখের দিকে না চেয়ে।

'চোখ তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বলো।'

তবু সেবা পারল না চোখ তুলতে।

'না, না, চেয়ে দেখ। ভয় পাবে না, চেয়ে দেখ, আশা এখনো ফুরিয়ে যায়নি। মরব না বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই প্রতিজ্ঞার আলো এখনো জ্বালিয়ে রেখেছি দু' চোখে।'

শুধু চালই কি ফুরিয়ে এসেছে? আয়ু আসেনি ফুরিয়ে? স্বাস্থ্য, প্রতিরোধের ক্ষমতা? মরব না, লড়ব—মেরুদণ্ডের এই উদ্ধতি আসছে না নত হয়ে? মুঠ থেকে কাছি খসে যাচ্ছে না ক্রমে-ক্রমে? সারা দিন টো-টো—মাড়োয়ারির আড়তে-গুদামে, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা লজ্‌ঝর লরির ঝাঁকুনি খেতে-খেতে—কোথায় উল্টাডাঙা, কোথায় খিদিরপুর, কাশিপুর থেকে টালিগঞ্জ—তারপর, ছাড় ছাড়া, চালান লেখা,

মাল-খালাসের রসিদ রাখা—তারপর সন্ধ্যায় গদিতে ফিরে এসে টোক-ফর্দ দেখে হিসাব-কিতাব বুঝসমুঝ করা। মাত্র চল্লিশ টাকার বিনিময়ে। সে কি লড়ছে না বলতে চাও? পণাপণ যাই হোক, ফলাফল যাই হোক, বলো, লড়ছে সে প্রাণপণ। অন্তত এটুকু তাকে মর্যাদা দিও। কিন্তু সামান্য এ চল্লিশ টাকায় সে চালাবে কি করে? কি করে সে নিজে খাবে, খাওয়াবে আর সবাইকে—বুড়ো বাপ-মা, পরের ভাইটা মরে গেলেও আছে আরেকটা ছোট ভাই আর বোন—আর সেবা! খেতে না পেলে শরীরে থাকবে কি করে বাঁচবার প্রতিজ্ঞা, কি করে বুকে করে বয়ে বেড়াবে প্রতিবিধানের প্রার্থনা? এক অস্তের পর আরেক উদয়ের জন্যে কি করে প্রতীক্ষা করে থাকবে, রাতের পর দিন? সে যদি এখন ভেঙে পড়ে—ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে সুজন পায়ে হেঁটে চলেছে পগেয়াপটির রাস্তা ধরে, রগচটা রোদ্দুরের মধ্য দিয়ে, জুতোর উদ্যত পেরেক থেকে যথাসাধ্য পা বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে—ভাবছে, সে যদি এখন ভেঙে পড়ে, পুঞ্জ-পুঞ্জ অবসাদের ভারে, হতাশায় আর অবসাদে, তা হলে যে সমস্ত পৃথিবী ভেঙে পড়ল, যুধ্যমান পৃথিবী, জায়মান জীবন। হাতের কাছি এখুনি ছেড়ে দিলে জাহাজ এখুনি বানচাল হয়ে যাবে। সমস্ত জয় তার উপর নির্ভর করছে, তাদের উপর। এখুনি টলে পড়লে চলবে না, এখুনি মাটি নিলে সব মাটি হয়ে যাবে। যদি হাঁটু দুটো বেঁকে আসতে চায়, গ্যাসপোস্টটা আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ না-হয় সে জিরিয়ে নিক। যদি খিদেতে সত্যিই আঁত শুকিয়ে দড়ি হয়ে গিয়ে থাকে, রাস্তার কল থেকে আঁজলা-আঁজলা জল খেয়ে নিক পেট ভরে।

সুধাকে সে কোথায়, কত দূর নামিয়ে নিয়ে এসেছে! আগে কত কিছুর জন্যে তার খিদে ছিল, আলো আর বাতাস, আরাম আর অবসর, এখন সে-খিদে জঠরে এসে স্থান নিয়েছে, স্থূল পাকস্থলীতে। মনে হচ্ছে এর চেয়ে মহত্তর আর কোনো খিদে নেই। এর চেয়ে নেই

আর কোনো বলবত্তর আকর্ষণ। প্রেম বলো, যুদ্ধ বলো, স্বাধীনতা বলো, খিদে না মিটিয়ে নিলে কেউ কোথাও নেই আর তোমার দিগন্তে। তখন তোমার দিগন্ত পর্যন্ত দাবানল। সমস্ত স্বপ্ন আর সাধনা সেই সর্বভক্ষের রসনায় ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। আর কিছু চাইবার নেই, খোঁজবার নেই, শুধু দু' মুঠো ভাত—তুষের সঙ্গে কটি অন্তত তণ্ডুলকণা।

'এই নিন পয়সা।' সুজন জানকীবাবুর দিকে একটা দু'-আনি ছুঁড়ে দিল। 'যান, খুলেছে দোকান।'

'খুলেছে ?' মৃত কাঠে যেন পত্র সঞ্চার হল। কুঁকড়ে পড়ে ছিলেন জানকীবাবু, যন্ত্রণায় ঝিম খেয়ে, এবার টলতে-টলতে উঠে বসলেন। মুখে-চোখে মৌতাতের আঁচ জ্বলে উঠল।

'হ্যাঁ, কিউ করে দাঁড়িয়ে গেছে সব। শুধু এক কুঁচ করে দেবে।'

কাছা-কোঁচা সামলাতে-সামলাতে জানকীবাবু ছুট দিলেন। প্রায় চার দিন ধরে চড়াতে পারেননি মৌতাত, আফিঙের শোকে চিবিয়ে-ফেলা ছোবড়ার মত হয়েছিলেন, এবার যেন তাঁর কালো রক্তে লালের মদ, নীলের আমেজ লাগল। কিসের তোমরা হাবাতের মত ভাত-ভাত করছ, আমাকে শুধু এক ডেলা আফিং দাও, যদি মাত্রা চড়িয়ে দিতে চাও, আমি যাত্রা করতেও রাজি আছি। সাপের বিষ দিতে না পারো, দাও অহিফেন।

বাবাকে দোকানে পাঠিয়ে দিয়ে সুজন তাঁর টিনের বাক্সটা নিয়ে পড়ল। সেবাকে ডেকে নিল চুপিচুপি। বললে, 'খুলব এটা। এটার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে।'

সেবাও তাই মনে করত। কিন্তু, কেন কে জানে, ভয় হল তার। বললে, 'যদি এরি মধ্যে ফিরে আসেন ?'

'কোন ভরসা নেই। প্রায় এক মাইল লম্বা কিউ হয়েছে। এই

কিউতে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে গায়ের গন্ধেই তাঁর নেশা লেগে যাবে। চাবিটা কোথায় রাখেন জান ?'

এদিক-ওদিক একটু খোঁজাখুঁজি করে সেবা বললে, 'বোধ হয় নিজের কোমরেই রেখে দেন সব সময়। কিন্তু খুলে যদি সত্যিই কিছু পাও, করবে কি ?'

'করব কি ? স্রেফ চুরি করব। আমরা সবাই মরব ধুঁকে-ধুঁকে আর উনি এমনি করে যখ আগলাবেন, এ অসহ্য। চাবি না পাই, চাড় দিয়েই ভেঙে ফেলব।' স্বপ্রন চেষ্টা করে দেখল, হাতের কব্জিতে তার আর সেই জোর নেই। আঙুলগুলিও কেমন পাঁশুটে, ক্যাকাসে হয়ে গেছে।

তুমি জান না আমার বাবাকে। তুমি দেখছ আর ক'দিন, সমস্ত জীবন এই টিনের বাক্সটা তিনি আঁকড়ে আছেন বুকের কাছে। জমিদারের গোমস্তা ছিলেন, এক জীবনে কামিয়েছিলেন দু'পয়সা। করেছিলেন কিছু জমি-জিরাত, কিনেছিলেন কটা খাস-তালুক। তবিল তছরুপ করেছেন বলে শোনা গেল। নালিশী-বেনালিশী সমস্ত খাজনা নাকি গাপ করেছেন। বিনা-মঞ্জুরিতে পাওনা দিয়েছেন ছেড়ে, ঘুস নিয়ে। আদায়ী-অনাদায়ী সমস্ত টাকার জন্যে হিসাবনিকাশের মামলা করলেন জমিদার। আর, ঐ আগুন লেগে গেল। এক তলা থেকে আরেক তলা, শাখা থেকে ফেঁকড়ায়, খাই থেকে খানায়। তখনো তিনি আফিং ধরেননি, মোকদ্দমাই ছিল তাঁর যথেষ্ট নেশা। আর, নেশা যা হয়, হয়ে উঠল সর্বনাশা। জমি-জিরাত গেল, গেল সব হুজুরি-মজকুরি। নিজে হলেন উকিলের মুহুরি বা মোকদ্দমার ফড়ে বা উঞ্ছ-দালাল, আর আমাকে তালুকদারি বা তবিলদারির বদলে জুটিয়ে দিলেন মাস্টারি। কিন্তু যাই বলো, মুহুরিদেরও তহুরি আছে, আমলা-ফয়লার সঙ্গে আছে অনেক গাঁ-শোঁকাশুঁকি। নিশ্চয়ই কিছু জমিয়েছিলেন শেষ

বয়সে। হাড়-কিপটে, বুকের পাঁজর খসে যাবে, অথচ বাক্সের ডালাটা খুলবেন না।

কয়লা-ভাঙার ভাঙা হাতুড়ি ও শক্ত এক টুকরো ঝামা সেবা এনে দিল সুজনকে।

চুরি করছি? যে উপস্বত্বে একদিন আমার নিশ্চিত উত্তরাধিকার তাকে নেওয়া কখনো চুরি হতে পারে?

তালা ভাঙছি? তার চেয়ে বল না কেন খিল ভাঙছি। শুধু দরজার খিল নয়, মাটির খিল। গরলায়েক পতিত জমিতে হলচালনা করছি।

শুকনো ক'কেতা কাগজ পড়ে আছে। না, কোম্পানির কাগজ নয়, নয় কোনো খত বা হ্যাণ্ডনোট, শুধু আদালতের রায়ের ক'খানা জাবেদা নকল। যে নকলে এসে তাঁর সমস্ত বিষয়-আসয় খেত-খামার জোত-জমি সব পর্যবসিত হয়েছে। যে নকলে আসলের আবাসখানা এখনো ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যায়। জায়গায়-জায়গায় দাগিয়েছেন পেন্সিল দিয়ে, যে জায়গাগুলিকে ভেবেছেন নিজের অনুকূলে, আর যেখানে আদালতের সিদ্ধান্ত তাঁর বিরুদ্ধে, সেখানেই ক্রুদ্ধ টিপ্পনি কেটেছেন। হাকিম যে নিরেট নির্বোধ আর পৃথিবী যে অরিষ্টদুষ্ট তারই প্রমাণ রেখেছেন তাঁর ও-সব টিকা-ভাষ্যে। ধর্ম যে আসলে তাঁরই পক্ষে তারই নির্মম প্রত্যায়ন।

'মা গো, একটু ফেন দাও, মা'......

এ-ডাক এরা কোত্থেকে শিখল, কোন মার রন্ধনশালায় ?

ঝাঁক বেঁধে, কাতার দিয়ে লোক আসছে শহরে, আকাশ-কালো-করা পঙ্গপালের মত। কি বলবে এদের ? ভিক্ষুক বলবে, না, ক্ষুধার্ত বলবে ? দেনদার বলবে, না, বলবে দাবিদার ?

'তুই তো বেটা পাঁড় পেশাদার। চা তো দেখি ভিক্ষে।'

'চাট্টি ভাত দেবে—'

'আর তুমি চাও তো।'

'একটুখানি ফেন দাও, বাবু।'

কোত্থেকে শিখল তারা এ-ডাক অন্তরের কোন অন্তস্তল থেকে ? উদরের ভাষায় কে কবে শুনেছে এই আত্মার আকুতি ? কোত্থেকে পেল তারা এ নির্লজ্জ সারল্য, এই দ্বিধাহীন দারিদ্র্যের উদঘাটন ? স্বরে ও পোষাকে, চলনে ও চাউনিতে। ভীরু অথচ প্রবল, লাজুক অথচ অকপট, কোত্থেকে পেল তারা এই বাঁচবার তৃষ্ণা, মৃত্যুর অস্বীকার ? ভিক্ষার সুরের ছদ্মবেশে কে আনল আজ দাবির ঘোষণা ?

গ্রাম-গ্রামান্ত থেকে এসে পড়েছে সব, পায়ে হেঁটে, ট্রেনের পা-দানিতে চড়ে। এসেছে সৎচাষী আর সূত্রধর, মাহিষ্য আর ক্ষিরতাঁতি, কাপালি আর কয়াল। রিশি-বেহারা, কেওড়া-কাহার, করন-কাবাসী। এসেছে অভিলাষ আর হৃদয়, দীননাথ আর পঞ্চুরাম। যুগলবালা, ক্ষিরোদা, শরৎযামিনী। মুসলমানও কি নেই ? আছে। আছে গোপাল মোল্লা,

ইজ্জত আলি, দরবেশ কারিকর। সরমান বিবি, জোবেদা খাতুন, গোলেহারনেছা। কেউ দাঁড় টানত, কেউ পালকি বাইত, কেউ ঘর ছাইত, জন দিয়ে বেড়াত। কেউ চাক ঘোরাত, জাল ফেলত, চামড়া ঘাঁটত। জমিহীন জনমজুরের দল। কেউ গাছ বাছত, জিরেন কাটত, গাড়ি চালাত। মেয়েদের মধ্যে কেউ কাঁড়ত ধান, কেউ ঝাড়ত চাল। কেউ চিড়ে কুটত, ভাজনা খোলায় ভাজত মুড়ি-খই। কেউ ঘুঁটে দিত, শাক বেচত বাজারে। হিঞ্চে, কলমি, পুঁই। দুধে চিনি না পড়লেও কেউ ভাবেনি শাকে বালি পড়বে। কেউ বাঁশের বেঁড়া বাঁধত কঞ্চি দিয়ে, কেউ-কেউ বা ঝুড়ি আর খারা, গরুর মুখের ঠুসি আর ছাগলের গলার তেকাটা। তল্লা বাঁশে কেউ-কেউ বা বানাত কুলো-ডালা, চ্যাঙারি-চালুনি, খেটে-পিটে করে-কম্মে সবাই নুন-ভাত খেয়ে ছিল তারা, আজ নুন চলে গেছে জলের তলে আর চাল উঠেছে চালের চুড়োয়। তাই তারা সব বেরিয়ে পড়েছে চালের খোঁজে চালের চালবাজিতে। ভিটে-মাটি চাটি হয়ে গেছে তাদের, গরু-বাছুর কবে দিয়েছে বেচে, হাটের স্যাকরার কাছে তাদের ঘটি-বাটিটা পর্যন্ত বাঁধা।

থতমত খেয়ে গেছে তারা। জাঁকালো-জাঁদরেল বাড়ি দেখে, গাড়ি-ঘোড়া ট্রাম-মোটর দেখে, বিলাসের লাসবেশ দেখে। ভাবতে পারেনি এমন একটা পাথুরে জায়গা। বুঝতে পারছে না, কোথায় রাখবে তাদের এ কণ্ঠস্বর, কার সঙ্গে মেলাবে? কাকে শোনাবে এই প্রকাশ করতে না পারার দীনতা? করুণ দীনতা? এত ব্যস্ততার মাঝে কে চাইবে তাদের মুখের দিকে?

না, না-তাকিয়ে উপায় কী? দলে-বিদলে লোক আসছে। আরো লোক। আরো লোক। মৌশুমি বাতাসে বৃষ্টির কণার মত। এবার শুনতে হবে কান পেতে, অন্তিমের কান্না, সদ্যোজাতের কান্না। কোণ-কানাচে অন্ধিসন্ধিতে সব জায়গায় এই কাঙালের ভিড। জায়গা ছেড়ে

দিতে হবে তোমাকে, তোমার ফুটপাত, তোমার গাড়ি-বারান্দা। অন্ধকারে গেট খুলে বাড়ি ঢোকবার সময় অন্তত দুটো দেহ না মাড়িয়ে তোমার নিস্তার নেই।

'ও রকম কাতরাচ্ছ কেন?'

'বুঝতে পাচ্ছি না।'

'হাসপাতালে যাবে?'

'শুধু যমের বাড়ির ঠিকানা নিয়েই এসেছি, হাসপাতাল কোন ঠেঁয়ে তার কি জানি?'

শুনে তখন তুমি তাকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। তোমাকে বাধ্য করাবে। না পাঠালে কানের কাছে তার এই বীভৎস কাতরানিতে রাতে তোমার ঘুম আসবে না।

প্যাকাটির মত একটা শিশু মরে আছে বুঝি তোমার রোয়াকের নিচে। মা তাকে ত্যাগ করে গেছে জন্ম-কলঙ্কিত নয় বলে, মৃত্যু-কলঙ্কিত বলে। এ মরা বেরালের বাচ্চা নয় যে মেথর ডেকে বকশিস করলে আর কারু বাড়ির দরজায় চালান দেবে। এর সংকারের ব্যবস্থা করতে হবে তোমার। খবরদারি করতে হবে। এই স্তূপীভূত মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে যাবার আর তোমার সাধ্য নেই। মুহূর্তের জন্যে হলেও মনে-মনে তোমাকে মেনে নিতে হবে যে অন্তত মৃত্যুতে তুমি ওদের সমান।

হকচকিয়ে গেছে তারা, গাড়ির শব্দ শুনে, রেডিয়োর গান শুনে, মেয়ে-পুরুষের হৈ-হুল্লোড় শুনে। আর দেখছে কত দোকান, কত জিনিস, কত কাপড়, কত খাবার। যারা কিনছে, তারা কেমন মসৃণভাবেই কিনছে। যারা খাচ্ছে তাদের তৃপ্তির কোমলতায় একটুও খোঁচ লাগছে না। সমস্তই কেমন সহজ অভ্যাসের ব্যাপার। সুস্থ লোকের স্নান করার মতই গা-সওয়া। একবার চোখ বুজে কি ভাবা যায় না, সে বদলে

গেছে ঐ লোকটাতে, জিনিস কিনছে স্তূপাকার, ঐ লোকটাতে, জিভে-মুখে শব্দ করতে-করতে খাচ্ছে যে ঐ চেয়ারে বসে ?

দুটি মেয়ে সিনেমার সামনে রাস্তার উপর অপেক্ষা করছিল তাদের বয়-ফ্রেণ্ডের জন্য। একটি নোটন-পায়রা, অন্যটি ঝোঁটন-বুলবুলি। আমাদের ফুলবাড়ির সুভঙ্গবালা দাসী আধখানা মুখের উপর ঘোমটা টেনে হঠাৎ ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ওর ছেলে বন্যায় গিয়েছে ভেসে, ওর স্বামী ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়েছে চাকার তলায়। সঙ্গে আছে দুটো ছানাপোনা। একটা কাঁখে, আরেকটা হাত ধরে। বেঁকে ঝুঁকে পড়ে একটা মাই চোসে, আরেকটা নিজের আঙুল কামড়ায়।

'কিছু দেবে মা খেতে ? এই বাচ্চা দুটো—'

অভ্যেস নেই কোনো দিন, সুভঙ্গ কথাটার মাঝে যেন সেই সুর আনতে পারল না। যেন এল খানিকটা লজ্জা, আর একটা অকারণ সম্ভ্রমের অনুভব।

না, ফোটাতে হবে সেই বুকফাটা হাহাকার, একটিমাত্র করুণ সম্বোধনে।

'মা, মা গো—'

আর উপেক্ষা করতে পারল না।

'তিন দিন খেতে পাইনি। দেখ চেয়ে, বাচ্চাদের পেটে-পিঠে এক হয়ে আছে।'

নোটনটি টলল বোধ হয়। সে তার থলের থেকে আরেকটা ছোট থলে বের করে একটি ডবল পয়সা তুলে নিল। আলতো করে ধরল তার আঙুলের ডগায়।

ঝোঁটন এল ঝাপটা দিয়ে : 'দিসনে, খবরদার দিসনে। কত দিবি

তুই এক ধার থেকে ? দিয়ে কি করতে পারবি তুই ? জানিস না, বার্নার্ড শ কি বলেছে ?'

'কি ?' নামমোহিত হয়ে তাকাল নোটন।

'বলেছে, ভিখিরিকে সাহায্য করা মানে সংসারে আরেকটি ভিখিরি সৃষ্টি করা। মানে, যে দেবে, খালি দেবে, দিতে-দিতে ফতুর হয়ে সে ফের ভিখিরি হয়ে যাবে। সুতরাং ভিখিরিকে কখনো সাহায্য কোরো না। ভিখিরিকে প্রশ্রয় দেয়া মানেই তাকে কায়েমী করে রাখা, তার দল বাড়ানো। আর কেউ মরছে বলে আমাকে মরতে হবে এটার কোন মানে নেই।'

নোটন তার আঙুলের ডগা দুটি যেমন-কে-তেমন ছোট থলেতে নিমজ্জিত করল। শব্দ না করে সাবধানে রেখে দিল ডবল পয়সাটা। সুভঙ্গ এবার গেল পত্তনীকোঁচার এক লক্কা-পায়রার কাছে। এত উড়ু-উড়ু উদাসীন যে দেখলে মনে হয় না, যুদ্ধের খবর রাখে, খবর রাখে এ দুর্ভিক্ষের। কে এ ভিক্ষে চাইছে, কেন এ ভিক্ষে চাইছে, ফিরে তাকাবারো তার সময় হয় না। যেমন হ্যাণ্ডবিল বিলি করতে এলে হাত বাড়িয়ে নেয় না সে কখনো হ্যাণ্ডবিল।

সেবাদের ব্যারাকবাড়িও ছেঁকে ধরেছে এই হাঘরে-হাবাতের দল। নর্দামায় ফেন খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের মোক্ষমণি। এসেছে সোনারপুর থেকে। ফুটপাতের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে মুখের উপর মাছি গুনছে আমাদের ভূষণ ঘাসী। এসেছে মাকড়দা থেকে। আর ওকে চেন ? ঐ যে হাতের চেটোতে করে দশ-পনেরো মিনিট অন্তর জিভ ঠেকিয়ে-ঠেকিয়ে রসগোল্লার সিরে চেটে খাচ্ছে, ওর নাম দ্বিজবর রুইদাস। এসেছে বীরশিবপুর থেকে। কোন দিক থেকে আসেনি বলতে চাও ? বৈদ্যবাটি-ভদ্রেশ্বর, সিঙ্গুর-হরিপাল, বংশবাটি-ত্রিবেণী, আন্দুল-উলুবেড়ে, ধানকুড়ে-আড়বেলে, ডোমজুড়-চাঁপাডাঙা, মল্লিকপুর-বারুইপুর, মসলন্দপুর-গোবর

ডাঙা, ঘোলসাহাপুর-সখের বাজার—আছে দিকবিদিকের প্রতিনিধি। কাকে ছেড়ে তুমি কাকে দেখবে? আর কে ঐ মরে আছে না? হ্যাঁ, মা-টা মরে আছে, আর কোলের শিশুটা তার বুকের উপর পড়ে মাই চুষছে।

'আর দেখতে পারি না, শুনতে পারি না ওদের কান্না।' সেবা নিজেই কেমন কাতরে ওঠে।

'না, শুনে রাখ, শিখে রাখ ভাল করে।' সুজন তার পাশ ঘেঁসে দাঁড়ায়· 'এবার আমাদের পালা।'

১৬

গত যুদ্ধে দেখা দিয়েছিল খাটো চুল আর খাটো ঘাগরা, হাত-কাটা খাটো শার্ট আর পা-কাটা খাটো প্যাণ্ট। এবার দেখি দিয়েছে রেশনের থলে।

সম্ভ্রান্ত ভিক্ষার ঝুলি।

নিম্ন মধ্যবিত্তের দল। আপিস-আদালতের কেরানি, আমলা-ফয়লা তো বটেই, আরো একটু উপরের লোক। যারা বাজারে যাবার অবসর পায়নি এত দিন, যাদের সমস্ত জীবনের আভিজাত্য ছিল বা এই বাজারে না যাওয়ায়, তারাও। সবাই আজ বীরের ভঙ্গিতে থলে ঝুলিয়ে চলেছে। আগে হলে প্রকাশ্যে এমন ধারা একটা বোঝা বহন করার মধ্যে থাকত লজ্জা বা হীনতার ভাব, এখন এটা গর্ব বা সৌভাগ্যের নিদর্শন হয়ে উঠেছে। যার হাতে এই থলে সেই আজ ঈর্ষণীয়। সবাইর জঠরে জলছে যে নির্লজ্জ আগুন এই কথা রাষ্ট্র করে দিতে আজ আর কারু আপত্তি নেই। উপরিতন সমস্ত আপাতরম্যতার পিছনে আছে যে এই মৌল আদিম বর্বরতা তা আজ বিকট দন্তে প্রকটিত। সদাগরী আপিসে যে সুট পরে যায় তারো হাতে আজ রসদের থলে।

শুধু দু'দল বাদ পড়েছে। এক দল, যারা বসে আছে উঁচু দাঁড়ে, নির্বিঘ্ন কৌলীন্যে। বনেদী বেনিয়াপনাতে। স্বকর্মসাধন ছাড়া আর যাদের কিছু সন্ধান নেই জীবনে। যাদের কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে ঘুস নেবার মত লোক, যাদের হাতে আছে বা ঘুস দেবার মত স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাধীনতা। ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে যাদের মুরুব্বি-মাতব্বরের পাহারা। খিড়কির

দরজা দিয়ে যাদের বাড়িতে এসে মাল মজুত হচ্ছে। চাল-ডাল চিনি-ময়দা তেল-নুন। ভক্ষণের চেয়ে রক্ষণেই যাদের বেশি আনন্দ, বেশি মর্যাদা। আর, কে না জানে, যে যত স্তূপবান সেই তত স্তূয়মান সংসারে।

আরেক দল ইস্কুল মাস্টার।

জীবনে তাদের রস নেই, রসদও নেই। সংসারে তারা অবান্তর, অপদার্থ। নয় যেন তারা আসল কারিকরের হাতের জিনিস। তারা খেলো, তারা নিরেশ। তারা নকল।

দশটা না বাজতেই সুজন চলে যায় মাড়োয়ারির গদিতে। সত্যি-সত্যি গদিতে। আধহাত মোটা তোষকের উপর জাজিম পাতা। দেয়ালের ধার ঘেঁসে তাকিয়া। তাতে ঠেস দিয়ে বসা বৃহদ্বপু মাড়োয়ারি, তার ছেলে আর ভাতিজা। সকলের সামনেই একটা করে কাঠের বাক্স। বেনিয়ান গায়ে, পেটের দিকে বোতাম খোলা। গলায় সরু সোনার হার, বাহুতে বাজুবন্দ। উদার উদর প্রায় উর্ধ্বোত্থিত। সেই উদরের স্থৌল্যে দুর্ভেদ্য নিশ্চিন্ততা, মাংসল পরিতৃপ্তি।

চিলের মধ্যে চড়ুইয়ের মত সেই সভায় সুজনেরও বসবার জায়গা, তারো জন্যে একটা কাঠের বাক্স, তাকিয়াটা নেই শুধু পিছনের দিকে। উদ্বৃত্তির পাশে উপবাস, অপচয়ের পাশে শীর্ণতা—বরণীয়ের পাশে বরখাস্ত—সমস্তটাই তার কাছে লাগে একটা মস্ত তামাসার মত। এক হাত দূরের লোকের সঙ্গে এক জগতের ব্যবধান। ভাবতেও কেমন অসম্ভব মনে হয়। মনে হয়, সত্যি-সত্যিই এটা তামাসা হয়ে যেতে পারে না? মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে না কোনো ভানুমতীর খেলা? যাতে এক পলকে জায়গা বদল হয়ে গিয়েছে তাদের। সুজন বসেছে অমন বিস্ফারিত উদরে, আর মাড়োয়ারি তার ছেলে ও ভাতিজাকে নিয়ে বসে আছে চৌকাঠের বাইরে, কুণ্ঠায় কাঠ হয়ে। নিমেষে ঘটে যেতে পারে না এ ভেলকি?

শুধু চাল-ডাল আটা-চিনিরই ছাড় ছাড়া নয়, কাটা হয় হুণ্ডি, খাড়া আর মুদ্দতী। সাহেবসুবোর পর্যন্ত জুতো খুলে গদিতে উঠে আসতে হয়, নইলে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে চেক কাটো বা হুণ্ডি লেখ। বা, লেনদেনের হিসেব মেটাও। টাকার এত গরম যে কারু কাছে এতটুকু নরম হবার দরকার মনে করে না। সমস্ত হালি আদব-কায়দা আসবাব-সরঞ্জামকে বেপরোয়ার মত উপেক্ষা করে, উপেক্ষা করবার মত শক্তি পায় অনায়াস।

এই শক্তির উৎস হচ্ছে টাকা, বে-খিরকিচ টাকা।

গদি ছেড়ে ফের চলে আসতে হয় গুদামে। কখনো উল্টোডিঙি, কখনো বাজেশিবপুর। জাঁদরেল গুদাম, অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। উপরে টিনের চাল, নিচে ঢালা পাকা মেঝে। তার উপর সারি-সারি বস্তার গাদি মারা। প্রায় চাল ছোঁয়-ছোঁয়। কোনোটা চিনি, কোনোটা বা মুশুর ডালের। অঢেল, অপর্যাপ্ত। প্রথমটা দেখলে মনে হয় বাইরের এ অনটনটা যেন মিথ্যে কথা। এত যেখানে খাবার রয়েছে জমা করা সেখানে লোকের কিসের কি অভাব। আর কতক্ষণ তলিয়ে ভাববার পর মনে হয়, সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দি। শেষকালে অসহায়ের মত ভাবে, যদি অন্তত পারতাম কিছু চুরি করতে।

লরি আসে, আসে গরুর গাড়ি। যে সব ছাড সমুদ্রে। কুলিরা পিঠে করে মাল তোলে। প্রতি পদে তাদের পয়সা। মাল তুলতে, মাল সাজাতে, বস্তা টুটা থাকলে তা গুণছুঁচ দিয়ে সেলাই করতে। এ সব বরাদ্দ পয়সা। কিন্তু মাঝে-মাঝে খিড়কির দরজায় এসেও গাড়ি দাঁড়ায় অন্ধ গলির অন্ধকারে। সেইখানেই কালো বাজার। সেইখানে সামান্য কুলির দাবিও অত্যন্ত তেজস্কর। সেইখানে পয়সার চেয়ে জিনিসেরই বেশি জেল্লা।

লরি যায়, যায় গরুর গাড়ি, পিছনের বস্তায় কারা হঠাৎ একটা ধারালো শলা ঢুকিয়ে খোঁচা মারে। ফুটো দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে চালের সরু আঁকা-বাঁকা রেখা। চাকা যদি কখনো কোনো ঢিবিতে বা খোঁড়লে ঘা খায়, তখন ছিটকে বেরিয়ে আসে ছোট একটি বা ডেলা, হয়তো বা আধমুঠ। পিছনের লোক অনেকদূর পর্যন্ত এই রেখা ধরে ছুটে চলে। যতক্ষণ না অরেক বস্তায় চাপা পড়ে যায় সেই ফুটো।

ধীরেন সাধুখাঁও গদিতে লেখা-পড়ার কাজ করে। হাড়গিলের মত চেহারা। ড্যাবডেবে চোখে ইতি-উতি কি খুঁজে বেড়ায় সব সময়। বলে, 'হাড়ভাঙা মেহনৎ করছি রাত-দিন, বস্তা-বস্তা মাল থাকতে আমরাই বা পাব না কেন ছিটেফোঁটা ?'

সুজনকে সে স্তাঙাত ঠাওরায়। দাবির বৈধতায় সুজনও কোমর বাঁধে।

কিন্তু মজুতদারের তহবিলে লোভ আর লাভের বাইরে আর কোনোই কপর্দক নেই।

'হ্যাঁ, ওরা রেশন দেবে না হাতি।' সাধুখাঁ নিচের ঠোঁটটা ভারি করে ঝুলিয়ে দিল অনেকখানি। 'যেমন ওরা কলসি তেমনি আমরা সরা হব। যেমনি ওরা দেবতা তেমনি আমাদের নৈবেদ্য। আমরা চুরি করব।'

আশ্চর্য! সুজনের মনে এতটুকু আঁচড় লাগল না। মসৃণ, মোলায়েম। তা ছাড়া আর কি! যে ক্ষুধাখিন্ন, সংস্থানহীন, সে চুরি করবে না তো কে করবে? সাধুতার ভীরুতা তো তাদের, যারা চৌর্য দিয়ে গড়ে তুলেছে পর্বতপ্রমাণ প্রাচুর্যকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষে পায়, বা পাবে বলে আশা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত চুরি করে না। কিন্তু না দেবে ভাগ, না দেবে ভিক্ষা। না ন্যায়, না করুণা। তখন কি করবে এই নিঃসম্বলের দল? ভিক্ষে করে-করে ব্যর্থ হতে-হতেই হাতের শক্তি-

যাবে ক্ষয় হয়ে। যেটুকু বা থাকবে তা শুধু কপালে শেষ করাঘাত করবার জন্যে। তাই, দেরি নয়, এখুনি, বেঁচে থাকতে-থাকতেই।

'পারবি ?' গলা নামিয়ে জিগগেস করে সুজন।

'না পারলে চলবে কেন ? বেঁচে থাকার মান রাখতে হবে তো ?'

ঘোগ বাসা নেয় বাঘের ঘরেই। আড়তে খবরগিরি করে নিধু ভঞ্জ। তার সঙ্গে সাধুখাঁ একদিন চোখ-টেপাটিপি করে।

কাঁটা নেই গুদামে, তাই মাল মেপে দেবার ব্যবস্থা নেই। বস্তা ধরে মাপ, ওজনের ছাপ রয়েছে গায়ে। দু' মণ কুড়ি বা এক মণ চল্লিশ সের করে। বস্তা পিছু দু'সের-আড়াই সের করে ঘাঁটতি। চাল-সুমারের হিসেবে গোড়াতেই প্রকাণ্ড মুনফা মেরে নিয়েছে মহাজন। তারপর মাল এসে পড়ছে, মহাজনের দারোয়ান, নিধু ভঞ্জের খপ্পরে। সে আবার বস্তা ফুটো করে আরো দু'সের করে ঘাঁটতি ঘটিয়ে কোল-বস্তা তৈরি করেছে। কোনোটা ভরা মণ, কোনোটা বা ত্রিশ-বত্রিশের কাছাকাছি। সেই সব কোল-বস্তা বেচছে সে খাদক-খদ্দেরদের কাছে, একটু বা দরের সুবিধে করে। মূল বস্তা পাঁচ-ছ'সেরী ঘাঁটতি নিয়ে উঠছে গিয়ে ছুটো মহাজনের মুদিখানায়। কখনো দাঁড়িপাল্লা, কখনো বা বাটখারার কারসাজিতে পুষিয়ে নিচ্ছে ষোল পণ।

চলছে এমনি চাকার ভিতরে চাকা। চুরির ভিতরে জুয়াচুরি।

আড়ত-গদির লোকদের মাঝে-মাঝে নিধু ঠাণ্ডা রাখে খাইয়ে, যারা অবিশ্যি ভিতরের খবর রাখে, গুদামের মধ্যে গুদামের খবর। বিনিময়ে আশা করে মদ কিংবা মদিরার সন্ধান।

'এ আর বেশি কি কথা ? নিয়ে যাস তোরা দু' বস্তা। তোরা তো ঘরের লোক, আত্মীয়ের সামিল।' নিধু ভঞ্জ উদার ভঙ্গি করে।

সুজন বলে ধীরেনের মুখের উপর: 'এ চুরি কোথায় ? এ তো দান।'

ধীরেন চোখ মটকায়। 'কিন্তু জেনে-শুনে চোরাই জিনিস ঘরে তুলেছিস, সাফাই গাইলে চলবে কেন ?'

'কে বললে, আমরা জানি-শুনি ? গুদাম থেকে আমাদের দিলে আমরা তাই বাড়ি নিয়ে গেলাম।' মনে-মনে দোষস্খালনের চেষ্টা করে সুজন।

'তার চেয়ে বল না কেন, আকাশ থেকে খসে পড়েছে আলটপকা। বলি, পেলি যে বস্তাটা, দাম দিয়েছিস ?' ধীরেন ফের চাউনিটা তেরছা করে : 'আর তোকে দান দিতে যাবে এই দুর্দিনে,—নিধু ভঞ্জ ? লোককে বলবার মত সাহস পাবি তুই বুকের মধ্যে ?'

সত্যিই। কাউকে বলা যাবে না, কেউ বিশ্বাস করবে না। ব্যাপারটার নিঃসন্দেহ চুরির চেহারা। মা-বাবা যাই ভাবুক, সেবা ভাববে যে সে চালের বস্তাটা চুরি করে এনেছে।

কেমন অস্থির করে উঠল। বললে, 'আচ্ছা, কিছু দাম দেয়া যায় না ? কম-সম করে ?'

ধীরেন হাওয়া করে দিল কথাটা। 'দাম দেব কোত্থেকে ? কাণা-কড়ির মুরোদ আছে আমাদের ?'

'আর নিধু ভঞ্জই বা কেন যে দেয় আমাদের—'

'স্রেফ ভালবেসে সাকরেদ বলে। আর নিধু আশা করে, কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যে বাড়িতে ওকে নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিবি এক দিন।'

'খাইয়ে দেব ?'

'হ্যাঁ, তোর সুন্দরীর রাঙা হাতের রান্না। চাউনির ফোড়ন পেলে আলুনিও রসাল হয়ে উঠবে নিধুর কাছে।'

সুজন শুকনো গলায় ঢোঁক গেলে। বলে, 'কিন্তু তুই কি করবি ?'

'আমি বিয়ে করিনি, বারও করতে পারিনি তোর মত।' হঠাৎ সুজনের মুখ বিশীর্ণ হয়ে উঠতেই সে তাড়াতাড়ি তার কাঁধের উপর হাত

রাখল। 'আমার অবিশ্যি ভাই শোনা কথা। একদিন একটা বেনামী চিঠি এসেছিল বদ্রীদাস বাবুর কাছে, তোর বিরুদ্ধে। লিখেছিল, তোকে চাকরিতে বাহাল রাখা উচিত নয়, তুই নাকি কোন ঘরের মেয়েকে পথে টেনে এনেছিস। বদ্রীদাস বাবু বললেন, তাতে আমার কি! আমার আড়তের মাল পথে বের না করলেই হল। আড়তের সঙ্গে আওরতের কোনই সম্পর্ক নেই।' বলে বদ্রীদাসের হাসিটাও ধীরেন এই সঙ্গে হেসে নিল।

'কার কাছে শুনেছিস এ সব?'

'নিধুর কছে। নিধু হচ্ছে গেঁটে বাঁশ, ঝুনো নারকেল।'

আগের কথায় ফিরে যায় সুজন। 'আর, তুই কি করবি?'

'আমি? আমাদের পাড়ার মাটকোটায় মেদিনীপুর থেকে এক কৈবর্ত এসেছে, সঙ্গে তার ভর-বয়সের একটা মেয়ে। এসেছে বানে ভেসে। মেয়েটাকে নাকি বেচে দেবে তার বাপ। বউনির খবরটা ভাবছি পৌঁছে দেব নিধুকে। ওটা অবিশ্যি আমার রঙের টেক্কা, শেষ পিটের খেলা। দেখি, অল্পে যদি হয়, দু' এক বোতল খাঁটি যদি জোগাড় করতে পারি—'

চুরি করাটা এর পর সুজনের কাছে অনেক সহজ মনে হল। মনে হল খেতে না পাওয়ার পাপের চেয়ে চুরি করে খাওয়াটা বেশি কলঙ্কিত নয়। স্ত্রীত্বের অমর্যাদা, পিতৃস্নেহের অপবিত্রতা কিছুই নয় খিদের পঙ্কিলতার কাছে। খেতে পাওয়াটাই হচ্ছে আদিম পুণ্যকর্ম। পদ্ধতিটা অবান্তর।

১৭

থার্ডক্লাশ ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে করে চাল নিয়ে এল সুজন। এক বস্তা। প্রায় পুরোপুরি ভর্তি। খয়রাত হিসেবে তার বত্রিশ-সেরাই একটা চালাতে চেয়েছিল নিধু, কিন্তু তার কোনখানে জল ঢেলে মাটি চটকে কাদা করতে হয় সুজন বুঝে নিয়েছে নিমেষে।

একটা মেয়েকে বার করবে মনে করে আরেকটা মেয়েকে বার করে এনেছে। যেটা প্রথম বাগে এল তাকে দিয়েই প্রথম বাগান সাজানো। ছ'দিন বাদেই ছেড়ে দেবে, চটক চটে যাবার আগেই। যার জন্যে গোড়ায় মন আঁকুপাঁকু করেছিল তার জন্যে ফের চার ফেলবে।

ধীরেনের কৈবর্তের মেয়ের চেয়ে ঢের বেশি জেল্লাদার। ধীরেন পেল বত্রিশ সের, সুজন প্রায় দু'মণ।

চাল নিয়ে সুজন এমন ভাবে এল গাড়ি চড়ে সে যেন চড়া দরে কিনে এনেছে, কেনবার মত আছে যেন তার খুঁতির দীর্ঘতা। তাই এল সে স্পষ্ট দিন থাকতে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নয়। এল সে রাস্তার অনেক কাঙাল-নিরন্নকে অলক্ষ্যে উপেক্ষা করে। সে যে বাঁচবে, সে যে মরবার দলে নয়, সেই স্বীকৃতির উজ্জ্বল জয়টিকা পরে।

সেবাকে বাইরে একবারও দেখতে পাওয়া যায় কিনা তারই আশায় বারিধি ঘুরঘুর করছিল। দেখতে পেল ছ্যাকড়া গাড়ি। দেখতে পেল চালের বস্তা। গাড়োয়ান ও রাস্তার একটা লোক ধরে হাত-ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরে। বেশ ভারি ওজনের মাল। রেশনের থলে বা পুঁটলি-পোঁটলা নয়, একেবারে বস্তা। বারিধি দুয়ে দুয়ে চার করলে।

শাখা থেকে চলে গেল সে শিকড়ে। আঁকড়ালো গিয়ে ধীরেন

সাধুখাঁকে। বললে, এটাকে একটা চুরির চেহারা দিতে হবে, কাঠামোর উপর চড়াতে হবে রাঙতার পাতা। কিছু টাকা গুঁজে দেয় তার পকেটে।

ধীরেন যেন পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এক কথায় সে রাজি। শুধু ঝোপ বুঝে কোপ মারা নয়, সে চায় সমূলে উন্মূল করতে।

'ভদ্দরলোকের মেয়ে বের করে নিয়ে এসেছে কিনা, তাই ওর বেশি জৌলুস। সেই যতই কেননা ঘুণে-খাওয়া ঝর্ঝরে হোক। আর মেদিনীপুরী কৈবর্ত-মেয়ে যতই কেননা হোক আনাজের মত টাটকা, সে রোতো, ওঁচা, লজঝর। বুঝলেন মশাই, ভেজালেই আজকাল বেশি ঝাঁজ। তাই আমার বেলায় বত্রিশ সের, আর ওর বেলায় দু'মণ।' ধীরেন একেবারে গোড়া ধরে টান দিতে চায়। নিধু ভঞ্জেরও ঘাড় ভাঙতে হবে, খাওয়াতে হবে উল্টোবাজি।

কিন্তু মুহূর্তেই কেমন গুটিয়ে গেল শামুকের মত। ভাবল, জটিল কোনো প্যাঁচ আছে বুঝি কোথাও। পকেটে টাকা গোঁজা মানেই হয়তো হাতে হাত-কড়ি পরানো।

কিন্তু, না, ভয়ের নেই কিছুই। বারিধি বিনীত দেশকর্মী, পুলিশের লোক নয়। তার পথটা শাসনের নয়, সংশোধনের। তার ভঙ্গিটা রোষের নয়, সহানুভূতির। অন্যায়ভাবে যে সঞ্চয় করে আর অন্যায়ভাবে যে সংগ্রহ করে, দুইই সমান অপরাধী। শেষোক্তই বরং বেশি পাপী, কেননা সংগ্রহই সঞ্চয়ের উদ্দীপক। সংগ্রহকে বন্ধ করতে পারলে সঞ্চয় আপনা হতেই নিশ্চল, নিষ্ফল হয়ে যাবে। ঘুস যে দেয় তার চেয়ে ঘুস যে নেয়, তারই বেশি কলঙ্ক। গৃহস্থ ঘর খোলা রাখবে বলেই চোর চুরি করবে এ যুক্তি অকর্মণ্য।

তা ছাড়া, শাস্তি দেয়ার নীতিই হচ্ছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। এক্ষেত্রে ধীরেন আর নিধু যখন অনুতপ্ত, তখন তাদের সতর্ক করে দিলেই যথেষ্ট

হবে এ যাত্রা। কিন্তু, নিজের পাড়াতে—বলা বাহুল্য বারিধি সুজনদের পাড়াতেই ঘুপটি একটা খুপরিতে এসে বাসা নিয়েছে—এত বড় অধর্ম সে বরদাস্ত করতে পারবে না। সমবন্টন ও সমভুঞ্জনের দিনে এত বড় অবিধি! বিশেষত, পথে-অপথে যখন এত কাতরতা, এত মৃত্যু। আরো বিশেষত, স্বয়ং সংগ্রাহক যখন নিজে একজন সমানীকরণের পক্ষকার। ভণ্ডামির চেয়ে স্বচ্ছ চুরি অনেক সহনীয়।

তিন জন যখন এক পাপে লিপ্ত, তখন যে কোনো দু' জনের সংযোগ তৃতীয় জনের সর্বনাশ, বিশেষ করে তৃতীয় জন যদি বোকার মত সত্যবাদী হয়। তাই মালিক বদ্রীদাস যখন জিগগেস করলে সে এক বস্তা চাল নিয়েছে কিনা গুদাম থেকে, তখন সুজন স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে বসল, 'নিয়েছি।'

'দাম দিয়েছ তার জন্যে ?'

'না।'

'তা হলে সেটা চুরি করা হল ?'

'হয়ত হল। কিন্তু আপনার চুরির তুলনায় সেটা কিছু নয়। আমারটা যদি গোষ্পদ, আপনারটা সমুদ্র। আমারটা খিদের জন্যে, আপনারটা লোভের।'

'মুখ সামলে কথা বলো। যে চোর, তাকে আমি রাখতে পারব না চাকরিতে। আজ থেকে তুমি বরবাদ, বরখাস্ত।'

অতি বড শুষ্কতায় সুজন একটু হাসল। বলল, 'কিন্তু আপনি কবে বরখাস্ত হবেন ? কবে ঘুচবে আপনার এ বড়ফট্টাই ?' পরক্ষণেই গলায় কেমন হঠাৎ একটা মিনতির হিমেল সুর বেজে উঠল, বললে, 'আমি চুরি করেছি অভাবে, স্বভাবে নয়, বেশি খাওয়ার লোভে নয়, একদম না খেতে পাওয়ার দুঃখে। তাই আমার চুরিটাই নিন, চাকরিটা নেবেন না। চাকরিটা নিয়ে চোর করে দেবেন না চিরকালের জন্যে।'

বদ্রীদাস টলবার লোক নন। বললেন, 'যখন চরিত্রের বিরুদ্ধে শুনেছিলাম তখনই বাতিল করে দেয়া উচিত ছিল। যার চরিত্রই নেই তার আছে কি।'

'চাকরি শুধু আমারই গেল?' কোপদীপ্ত সুজনের কণ্ঠ।

'আর কার। আর কে আছে এমন ছ্যাঁচড়া?'

'কেন, নিধু? নিধুই তো দিয়েছে আমাকে।'

'মিথ্যে কথা।' নিধু পাশেই ছিল দাঁড়িয়ে, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত টঙ্কার দিয়ে উঠল।

'আর একা আমি নাকি? ধীরেন নেয়নি?'

'মিথ্যে কথা।' ও-পাশ থেকে ধীরেন উঠল লাফ দিয়ে। 'নিজে ডুবছে বলে হাতের কাছের সবাইর পা ধরে জলে নামানোর ফন্দি।'

সত্যিই লজ্জায় ভীষণ অপরিচ্ছন্ন লাগছিল নিজেকে। আর কেউ চুরি করে পার পেয়েছে বলে নিজের চুরিটাকে প্রশ্রয় দেবার জন্যে সুপারিশ করা। আর কেউ মিথ্যার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেছে বলে নিজের সত্যভাষণকে ধিক্কার দেয়া। নিজে দরিদ্র হয়েছে বলে আর কাউকে সেই ভাগ্যহীনতার সমতলে নিয়ে আসা।

না, বাহাল থাক ওরা চাকরিতে। যত দিন পারুক লুটি খেয়ে নিক।

কিন্তু এ প্রশ্নেরই কোনো কূল খুঁজে পায়না সুজন, কি করে এ নালিশ মালিকের কানে পৌঁছুলো। তাই যাবার আগে সে বললে, 'আমি সত্যি কথা বলেছি, আপনিও একটা বলুন দয়া করে। কে আপনাকে জানাল আমার এই চুরির কথাটা?'

'কে আবার। যে তোমাকে দেখেছে চুরি করতে।'

'কে সে?'

'ধীরেন।'

স্বজন তাকাল একবার ধীরেনের দিকে। তার দৃষ্টিটাকে অবশ্য ছুঁতে পেল না। একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, 'এই আমি শুনতে চেয়েছিলুম এতক্ষণ। যে বন্ধু ছিল সেই যে অভিযোক্তা হবে এ তো পুরোনো কথা, পুরাণের কথা। ওর এই পুণ্যকাজের জন্যে মাইনেটা ওর বাড়িয়ে দেবেন যাতে না ওরও আর চুরি করবার প্রয়োজন ঘটে।'

স্বজন যখন বাড়ি ফিরল, তখন সে ভগ্ন, ছিন্ন, বিধ্বস্ত। কলকাতার কালো আকাশের অন্ধকার যেন ধোঁয়ার অন্ধকার। যেন একটা নির্বায়ু নির্বাষ্প পাথর।

ঘরে এখন কিছু চাল জমেছে বলে আবহাওয়াটা খানিক হালকা। এরি মধ্যে যা সম্বল তাই দিয়ে সেবা নিজেকে একটু ঘসা-মাজা করে নিয়েছে। ফুটিয়েছে একটু চেকনাই। হাসির ছিটেন দিয়ে কথা কইছে ননদ-দেওরের সঙ্গে। বাবার বুক-জাঁতা ঠনঠনে কাশটা তরল হয়েছে। রোগ-শোক ভুলে মা দেয়ালে পিঠ রেখে উঠে বসেছেন।

স্বজন তার ঘরে ঢুকে তক্তপোষের এক কোণে চুপ করে বসে রইল। লণ্ঠনটা ফেটে গিয়ে যেখানটায় কাগজের ফালি লাগানো হয়েছে সেদিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টে। ভাবতে লাগল, ঐ কাগজটা যদি ফুটো করে দেয়া যায় তা হলে আগুনের শিখাটা কি করে? খালি কাঁপে, না, কাঁপতে-কাঁপতে নিবে যায়?

রান্নাঘর থেকে কি কাজে সেবা চলে এসেছে ঘরের মধ্যে, কি একটা হাসির কথার জের টানতে-টানতে। উনুনের উপর ভাত ফুটছে, ওর চলায়-বলায় যেন সেই ফেনের টগবগুনি।

কোণের দিকে ছায়া-মত দেখে সেবা প্রথমটা শিউরে ওঠে। অর্ধ পলকেই ঠাহর করতে পেরে বলে ওঠে: 'ও কি, চুপটি করে বসে আছ যে? শরীর ভাল নেই?'

স্বজন নিঃশব্দ।

একটু ভীত একটু বা ত্বরিত পায়ে সেবা কাছে সরে আসে। স্বামীর কপালে ও গলার নিচে হাত রেখে বললে, 'জর হয়নি তো ?'

'না, জর হবে কেন ?' সুজন হঠাৎ স্ত্রীকে দুই দৃঢ় হাতে জড়িয়ে ধরে ভেঙে আনে বুকের উপর। কপালের থেকে কয়েক গাছ চুল উপরের দিকে সরিয়ে দিতে-দিতে বলে, 'আচ্ছা, তোমাকে আমি একটুও আদর করি না কেন বলতে পার ?'

'কে বলে কর না ?' গাঢ়, আচ্ছন্ন গলায় সেবা বলে ধীরে-ধীরে।

'না, করি না। হয়তো ভাবি, আমি গরিব, নিরন্ন, আমার প্রেমে গদগদ হবার অধিকার নেই। কিম্বা হয়তো ভাবি, এখন যুদ্ধ, প্রেম নিয়ে আনন্দ করবার সময় নয় এটা। ভুল, ভীষণ ভুল করি আমরা। আমাদের এই তো সময় এই অসময়। আমরা যারা বঞ্চিত, অস্বীকৃত—'

'ছাড়ো, ছাড়ো কে দেখে ফেলবে।'

'জানো, সেবা, আমার চাকরিটি আজ গেছে। কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে।'

স্পর্শের এত প্রাবল্য দিয়েও সেবাকে আঁকড়ে রাখা গেল না। কখন শিথিল ব্যবধান নেমে এল দুই বুকের মধ্যে। স্পর্শের এত তাপ দিয়েও শান্ত রাখা গেল না তার বুকের স্পন্দনকে, হঠাৎ কখন হিম-নির্জীব হয়ে এল। অনেকক্ষণ পর দমিত একটা আর্তনাদের টুকরোর মত ছুটে এল একটা প্রশ্ন· 'কেন ?'

'ও কটি চাল চুরি করেছিলুম বলে।'

'চুরি করেছিলে ?'

'হ্যাঁ, তুমি তো আগেই জানো, চুরি করেছিলুম। নইলে অতগুলি চাল একসঙ্গে কেনবার মত আমাদের সঙ্গতি কোথায় ?'

হ্যাঁ, সেবা আগেই জানত বৈকি। অন্তত বুঝতে পেরেছিল তো

নিশ্চয়। তবু কথাটা সুস্পষ্ট রূঢ়তায় উচ্চারিত হতে নিজেরো অলক্ষ্যে শিউরে উঠল একবার।

'তবু তোমার মনে হচ্ছে না সেবা ঐ চুরির চেয়ে এই চাকরি নিয়ে যাওয়াটা ঢের বড দুষ্কৃতি? ঢের বড় অপরাধ?'

সুজন বোধহয় আবার ব্যাকুল হাত বাড়িয়েছিল, জলের নিচে নোঙরের আশ্রয়ে। কিন্তু সেবা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ছিটকে।

তার আলিঙ্গন কলঙ্কিত বলে নয়, হাঁড়ির ফেন উনুনের আগুনে উথলে পড়েছে বলে।

চুরি-করা চালের স্বাদ কোন অংশে ফিকে বা পানসে নয়। তার ক্ষুধাহরণের ক্ষমতায় নেই এতটুকু ন্যূনতা।

সেবা চলে গেলে সুজন শুয়ে পড়ল তক্তপোষে, আদুড় কাঠের উপর। পৃথিবী কি তারি জন্যে তার কাছে খারিজ হয়ে যাবে? সে কি আর পৃথিবীকে অনুভব করতে পারবে না সুন্দর বলে, আয়ুষ্কর বলে? জীবনসাধন বলে? তার জীবনে নেমে এসেছে যে প্রেম, যে স্পন্দন তাকে সে অস্বীকার করবে? মৃত্যুর হাতে হতে দেবে বাজেয়াপ্ত?

তা ছাড়া আবার কি! যে হবে তার চিত্তের আরতি, সে হয়ে আছে কিনা সামান্য ভৃতিজীবিনী। যে হবে তার পরিচায়িকা তাকে সে পরিচারিকা করে ছেড়েছে। ক্ষুধার এত ধার যে ক্ষুরধার কামনাকে পর্যন্ত থেঁতো করে দেবে। এই ভাবে হারবে সে বর্বর ক্ষুধার কাছে, দর্পিত দারিদ্র্যের কাছে? পেটে দ পড়েছে বলে বুকও কি তার শূন্য-শীর্ণ হয়ে থাকবে? খাদ্যে তার ভাগ নেই বলে প্রেমেও কি তার অধিকার থাকবে না? প্রেম তার দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকবে—উপবাসী প্রার্থনার মত? অপরাধী প্রতীক্ষার মত?

নইলে সেবাকে সে নিবিড় করে গ্রহণ করে না কেন? কেন আচ্ছাদন করে না তার বিপুল বাহুচ্ছত্রে? তার হয়তো মনে হয়, কাব্যে ও

কামে তার সমান অনধিকার। যেহেতু সে ক্ষুধার্ত সেহেতু সে বর্জিত, বহিষ্কৃত। সেহেতু তার পৃথিবীকে ভালো লাগবার পর্যন্ত কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই।

কেন, কেন এই নতিস্বীকার?

ভেজা হাত আঁচলে মুছতে-মুছতে সেবা ঘরে ঢুকলো পিছন-থেকে-ধরে-ফেলা ক্লান্ত কয়েদীর মত। কোন কথা না বলে বসল এসে সুজনের পাশে।

তার একখানা হাত ধরল সুজন। তপ্ত পরিপূর্ণতায়। অন্ধকারে মুখ তার স্পষ্ট দেখা গেল না। তবু তার এই নীরবতায় যেন অনেক সাহস অনেক স্থৈর্য অনেক সামর্থ্য সে স্পষ্ট স্পর্শ করতে পারল।

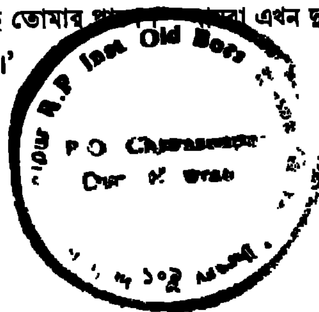
বলল, 'ওরা আমাদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে, সেবা। ওরা চায় না, আমরা বেঁচে থাকি, জীবনে বহন করি কোন অহংকার। অন্তত ভালোবাসার অহংকার। ওরা চায় আমরা মরে যাই, হেরে যাই, দূর হয়ে যাই। বলো, তাই যাব আমরা?'

'না।' সেবা বললে দৃঢ়, অথচ শান্ত কণ্ঠে।

'না, আমরা মরব না, হারব না কিছুতেই। ওদের সমস্ত জারিজুরি, সমস্ত জবরদস্তি ভেঙে দেব আমরা। শত অত্যাচারে বেঁচে থাকব। পারব না বেঁচে থাকতে?'

'খুব পারব।' স্বামীর স্পর্শময় স্নেহোচ্ছ্বাসে ধুয়ে যেতে-যেতে সেবা বললে, 'আমি আছি তোমার পা[illegible]রা এখন দু'জন।'

'আমরা বহুজন।'



১৮

'না, মা, আপনি না, আমি যাব।'

সুজনের মা, জগদ্ধাত্রী, দেশের বাড়ি থেকে ফিরে ছেলের পাশে বউ দেখে প্রথমটা ভয়ানক বিরূপ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক'দিনেই টের পেলেন এ বউ ছাড়া সংসার একদিনও চলবার নয়। রোগে-শোকে তাঁর হাত পা অচল, বুকের ভিতরটা একটু হলেই ধ্বক-ধ্বক করতে সুরু করে। এ দুঃসময়ে সেবা এসে কাঁধ পেতে না দিলে কেউ দাঁড়াতে পারত না। রাঁধুনি-চাকরানির সমস্ত কাজ সে একা করে, এক হাতে। সাত চড়েও রা কাড়ে না। এত যে ক্লান্তি এত যে ব্যর্থতা, তবু মুখের উপর নির্মল একটি শান্তির ভাব রাখে ফুটিয়ে। দুর্দিনের অবসানের আভাস।

দু' দিনেই জগদ্ধাত্রীর ভঙ্গিতে ভাঙন ধারল, ত্যাডা চোখ সোজা করে তাকালেন আর মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি নিজেও কখনো এমন বাছুনি করতে পারতেন না। তাঁর ছেলে যে কোনো দিন মামুলি ধরনের বিয়ে করে নগদ টাকা বা গয়নাগাটি আদায় করবে এমন ভরসা তাঁর ছিল না। বরং, যে রকম হাওয়া বইছে উত্তুরে, বিদঘুটে কি কাণ্ড করে বসে, কোন অজাত-কুজাতের মেয়ে নিয়ে আসে ঘরে, সেই ভয়ে তিনি তটস্থ ছিলেন। কিন্তু এ কী আজোড়-জোড়ন! পথ ভুলে মরুভূমির দেশে চলে এসেছে যেন স্বচ্ছ জলরেখা।

তবু এমন ভাব যেন কি অপরাধ করে আছে। যেন আর কারু ভাতে বসাচ্ছে ভাগ, আর কারু জায়গা দিয়েছে ছোট করে। উপস্থিতিতে এতটুকু তার উচ্চারণ নেই। নেই কোনো কর্তৃত্ব, এতটুকু আত্মঘোষণা।

বিরক্তিহীন, প্রতিবাদহীন, নেই এতটুকু বা ভাগ্যের কাছে অভিযোগ। অন্ধকার কোণের সংকীর্ণ আশ্রয়টুকু যে সে পেয়েছে তাইতেই সে পরম ধন্য। তার সমস্ত কাজ যেন পূজা, সমস্ত সহন যেন উৎসর্গ। যেন অনেক ক্ষমা অনেক দয়ায় সে প্রত্যাশী। মূর্তিমতী শুশ্রূষা সে।

হাত দিয়ে হাতি ঠেলছে। ডুবন্ত নৌকোর খোলে যে জল উঠছে তাই সে সেঁচছে ছিন্ন আঁচলে। টলবে না, দমবে না, পিছু হটবে না। বিনা যুদ্ধে মাটি দেবে না সূচ্যগ্র।

চোরাই চাল কবে গেছে ফুরিয়ে। এখন সম্মুখ যুদ্ধে কিনতে হবে কনট্রোলের দোকানে। মাথা-পিছু আড়াই সের।

প্রশ্ন উঠেছে: যাবে কে? জগদ্ধাত্রী না সেবা?

স্বজনের ছোট ভাই রাজন কোন সাত-সকালে বেরিয়ে গেছে কয়লার খোঁজে। কখন ফেরে তার ঠিক নেই। স্বজন এখন একটা সাবান ও গন্ধ-তেলের এজেন্সি নিয়েছে, রেশনের থলেতে মাল নিয়ে বাড়ি-বাড়ি ফিরি করে। মাইলের পর মাইল হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গিয়েছে তার। কাশিটা বেড়েছে ক'দিন ধরে, হাড়ের জর ভেসে উঠেছে চামড়ার উপর। বিছানায় শুয়ে আছে কুঁকড়ে। কাটা-কাটা শুনছে করুণ কথাবার্তা।

মা বলছেন, 'তুমি বউ মানুষ—'

সেবা উঠল আপত্তি করে, যেমন নম্র তেমনি দৃঢ়: 'আপনি বুড়ো মানুষ, রোদ মাথায় করে আপনি দাঁড়াবেন গিয়ে লাইনে? আর সেই চাল ফুটিয়ে মুখে তুলতে হবে আমাদের?'

'পারবে তুমি?' অনেক অনিচ্ছা ও অনেক অসহায়তায় প্রচ্ছন্ন এই প্রশ্ন।

'পারলে আমিই পারব। কষ্ট বা ক্লান্তি কিছুতেই আমাকে কায়দা করতে পারবে না। আর এতে তো অসম্মান কিছু নেই আমার।

আমার দারিদ্র্য তো আর আমার অসম্মান নয়, আমাদের সমাজের অসম্মান।'

পরে গেল সেবা সুজনের কাছে।

'আমি যাচ্ছি কনট্রোলের দোকানে। আড়াই-সের করে চাল দেবে শুনেছি। দোকান খুলবে দশটায়। আলাদা লাইন আছে মেয়েদের।'

'এ কি, ঝি সেজে নিলে না?'

'ঝি-র আর বাকি কি! পরনে ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, হাতে গালার চুড়ি এক গাছ করে, কোথাও আর তোমার সম্রান্ততার উল্লেখ রাখিনি—'

'কিন্তু তোমার মুখখানা? তোমার চেহারার চারুতা?'

'দুঃখের দিনে আমাকে তুমি আর হাসিও না। সকলের চেহারার ভেতর থেকে একই কঙ্কাল রয়েছে উঁকি মেরে। একই অভ্রান্ত পরিণতি।'

সুজন খানিকক্ষণ মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল সেবার দিকে। বললে গাঢ় গলায়, 'তুমিই যাবে সত্যি?'

'নিশ্চয়, আমিই তো যাব। তুমি ভুলে গেছ. তোমার মন্ত্র, সেদিন তুমি যা বলেছিলে আমার বুকের মধ্যে মুখ রেখে? আমরা মরব না, আমরা হারব না, আমরা হটব না এক চুল। কিসের তোমার ভয়? তুমি কি আজো সম্রান্ত? কাটা কান যে ঢাকবে তোমার চুল আছে?'

'আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি, তোমার ভীষণ কষ্ট হবে।'

'কষ্ট? না-খেতে পেয়ে তিল-তিল করে মরার কষ্টের চেয়েও কি বেশি?'

'সে-কষ্ট নয়। আমার মনে হচ্ছে কি জান, শেষ পর্যন্ত তুমি আনতে পারবে না। হয়, তোমার পৌছুবার আগেই চাল ফুরিয়ে যাবে, কিম্বা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে টলে পড়ে যাবে তুমি।'

'পা টলুক, তবু যেন প্রতিজ্ঞা না টলে। আমি যাব। আমি চেষ্টা

করব। বাঁচবার মহান চেষ্টা করব আমি।' বাক্স থেকে গুনে-গুনে পয়সা বের করে আঁচলে আঁট করে গিঁট দিল সেবা।

'ঝি ভেবে তোমাকে যদি কেউ রাস্তায় অপমান করে?'

'কে অপমান করবে? কিসের অপমান? যে কুকুরের ছাল নেই তার নাম আবার বাঘা। যে গরিব, তার আবার সম্মান! ছায়ায় তুমি ভূত দেখো না দয়া করে। ও-সব ঠুনকো সৌখিন জিনিস এবার বাদ দাও।' আঁচলটা সেবা শক্ত করে জড়িয়ে নিল কোমরে।

লম্বা লাইন হয়েছে দুটো। একটা পুরুষের, অন্যটা মেয়েদের। এরি মধ্যে দুটো-তিনটে করে মোড় নিয়েছে। সেবা দাঁড়ালো গিয়ে তার লাইনে, লাইনের শেষে। মনে হল না, দিনের শেষেও পৌঁছুতে পারবে দোকানের চৌকাঠে। তবু ভরসা পেল, যখন দেখল তারও পিছনে মেয়ে-ছেলে এসে জড়ো হচ্ছে ক্রমে-ক্রমে।

উলটো দিকে পুরুষের লাইনটাই সেবা লক্ষ্য করছে তখন থেকে। বিশেষ করে ঐ পুরু কাচের চশমা-পরা আট-ন বছরের ছেলেটির রোদে-জর্জর কাতর মুখখানির দিকে। এই দু'ঘণ্টায় সেবা হয়তো কুড়ি হাত এগিয়ে এসেছে, কিন্তু ঐ ছেলেটি দু'পা এগুতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। ভিড়ের চাপে দুই হাত বুকের উপর লেপটানো, কপালের ঘাম পড়ে চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে এলেও তা মুছে নেবার তার শক্তি নেই, অবসর নেই। সমস্ত সংসার তাকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে, নিজের স্বল্পতম আরামের জন্যেও সে তার মহান দায়িত্বে এতটুকুও শৈথিল্য আনবে না।

মেয়েদের দিকে পক্ষপাতিত্ব দেখান হচ্ছে। উপায় নেই। কিন্তু ছোট ছেলেদের জন্যে যদি আলাদা একটা লাইন থাকত, সেবা স্বস্তি পেত অনেক। অন্তত ঐ চশমা-পরা ছেলেটিকে যদি সে নিয়ে আসতে পারত তার নিজের লাইনে। সম্ভব নয়, খাকি পোষাকে অনেক তদবির

তদারক চলছে। এমন তদবির-তদারক যে অনেক পেয়ারের লোক পিছনের দরজা দিয়ে মাল নিয়ে যাচ্ছে লুকিয়ে-লুকিয়ে। কেউ-কেউ বা চলতি মোটরে তুলে নিয়ে, লাইন ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে।

'পিছনের লোককে সাবধান। দেখো যেন পকেট কাটে না।' হুঁসিয়ার করে দিচ্ছে।

'নেংটার আবার বাটপাড়ের ভয়।'

'কৌপিনের আবার পকেট।'

'গাঁয়ের নাম তেঘরে, তার আবার উত্তরপাড়া।'

আরো একটা মোটর আসছে গলির মধ্যে। লাইনে জাগছে আবার নড়া-চড়া। মোটরটাকে একটা মসৃণ মুক্তি দেবার জন্যে লাইনগুলি দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে, ত্যাড়াব্যাঁকা হয়ে পড়ছে। ভিড়ের চাপে তাগবাগ ঠিক থাকছে না। হঠাৎ সেবা লক্ষ্য করে দেখল, চশমা-পরা ছেলেটি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে লাইন থেকে। সেবার হাত-পা সেঁধিয়ে গেল পেটের মধ্যে আর বুকটা দমে গেল দশ হাত। এত বড একটা বিয়োগান্ত ব্যাপার সে কল্পনা করতে পারত না। চোখ চেয়ে দেখতে পাচ্ছে না সে এত বড় একটা নিঃসহায় ব্যর্থতা। ছেলেটা শূন্য স্তব্ধ চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে শ্রেণীবদ্ধ নিষ্ঠুরতার দিকে, তারপর ফের লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

সেবা যখন চাল পেল তখন বেলা তিনটে। তার নেবার কিছুক্ষণ পরেই দোকান গেল বন্ধ হয়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে সেবা তাকাল একবার সে ছেলেটির দিকে। দোকান বন্ধ হবার খবর তখনো তার কাছে এসে পৌঁছোয়নি। তখনো নতুন উদ্যমে সে প্রাণপণে ভিড় ঠেলছে।

গলি থেকে বেরিয়ে আসতেই গ্যাসপোস্টের নিচে কাকে দেখে সেবা থমকে গেল। কে-একজন বুড়ো-মতন লোক দাঁড়িয়ে আছে থামে হেলান

দিয়ে। যেন মাটিতে পড়ে যেতে-যেতে সামলে নিয়েছে কোনোরকমে। গায়ের জামা দিয়ে বুকের বিধ্বস্ত পাঁজর ক'খানাই সে ঢাকেনি, ঢেকেছে অনেক পরাজয় অনেক লাঞ্ছনার ইতিহাস। কেঁদে-ককিয়ে যা বলতে পারছে না যেন তারি নিরুচ্চার অভিব্যক্তি। সেবা ভেবেছিল ক্ষুধিত জনতার এমনি হয়ত নির্বিশেষ প্রতীক, কিন্তু ঠাহর করে চেয়ে দেখল, তার বাবা, শ্রীভূষণবাবু। হাতে রেশনের থলে।

মাটির মধ্যে সেঁধোনো কাকে বলে মাটির উপর দাঁড়িয়ে থেকেই বুঝতে পারল সেবা, এগুতে পারল না। পিছুতেও পারল না। ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত নিঃঝুম হয়ে রইল।

ভেবেছিল, বাবাই হয়তো সরে যাবেন। ঘৃণায় না হয়, লজ্জায়। রাগে না হয়, বিরাগে। কিন্তু, না, এগিয়ে এলেন দু'পা। আশ্চর্য, তারই অভিমুখে। নিঃসঙ্কোচে বললেন, 'পেলি তুই ?'

'পেয়েছি।'

'আমি পেলাম না। আমিও গিয়ে পৌঁছুলাম দোকানের কাছে, আর দোকান বন্ধ হয়ে গেল।'

সকল প্রশ্নের আগের প্রশ্ন, চাল পেয়েছিস কিনা। কেমন আছিস, কোথায় আছিস, কি ভাবে আছিস—এ সব কোনো প্রশ্নই আজ আর প্রধান নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, খিদে মেটাবার জন্যে চাল পেয়েছিস কিনা দু'মুঠো ?

'এখন কি করি ? কখন আবার দোকান খুলবে কে জানে।'

'বাড়িতে কি একেবারেই চাল নেই ?' সেবা তার হাতের থলেটা শক্ত করে ধরে রইল।

'কাল রাত থেকে নেই। কাল রাত থেকে সবাই আমরা অভুক্ত।' কেমন ভিক্ষুকের মত কণ্ঠস্বর শ্রীভূষণবাবুর।

'আমার থেকে কিছু নেবে ?' সেবা ব্যাগের মুখটা খুলে ধরল।

লোভে জলে উঠল শ্রীভূষণবাবুর চোখ। বললেন, 'দিতে পারবি?'

'কিছুটা পারব হয়তো।'

'তাই দে মা, লক্ষ্মী, যতটা পারিস—'

বাবার চোখের দিকে সেবা তাকাল আরেকবার বিস্মিতের মত। ঘৃণা নেই, রাগ নেই, বিতৃষ্ণা নেই—আছে শুধু ক্ষুধা।

সেবা ব্যাগটা আস্তে-আস্তে কাৎ করে ধরল। শ্রীভূষণবাবু দুঃখের তালিকাটা দীর্ঘ করে তুলতে লাগলেন। তিনি, সেবার মা, সেবার ছোট-ছোট ভাই-বোন সবাই না খেয়ে আছে, উপবাসের উপরে আছে রোগ, রোগের উপরে আছে ডাক্তারের ক্ষুধা। সেবার হাতের ব্যাগটা ক্রমশ উপুড় হতে লাগল।

'বেঁচে থাক মা, বেঁচে থাক মা—' শ্রীভূষণবাবু উদ্দীপনা জোগাতে লাগলেন।

এক সময়ে হঠাৎ তার অভুক্ত স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল, তার অভুক্ত দেওর-ননদের কথা। ব্যাগটাকে তাই সে ফের ক্ষিপ্র হাতে সোজা করে তুলল।

'বাঁচালি মা আমাকে। কি বলে আশীর্বাদ করব তোকে—'শ্রীভূষণবাবু বিড়বিড় করতে-করতে কেটে পড়লেন।

মেয়েকে ফেললেও ফেলতে পারলেন না তার দেয়া এই তণ্ডুল-ভিক্ষা।

অবস্থাটা আগাগোড়া উপলব্ধি করবার আগেই কে আরেকজন তার কাছে এসে দাঁড়াল। বললে অনুযোগের স্বরে, 'সব কটি চাল দিয়ে দিলে এমনি করে? এটা ভাল হল?'

'ও! আপনি?' চোখ চেয়ে বারিধিকে দেখতে পেয়ে সেবা কাঠ হয়ে গেল। বললে, 'আপনি এখানে? আপনিও লাইন ধরেছিলেন নাকি?'

'না। দূরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। দেখছিলাম এত পরিশ্রমের জিনিস কত সহজে বিলিয়ে দিলে এক পলকে—'

'বা, বাবাকে দেব না ?'

'দেবে বৈকি। যে বাবা অমানুষিক ভাবে মেরেছিল একদিন, আশ্রয় থেকে বার করে দিয়েছিল নির্দয়ের মত, তাকে না দিলে চলবে কেন ? রামায়ণ-মহাভারতের মান তো রাখতে হবে।'

'আশ্রয় থেকে একা শুধু বাবাই বার করে দেন নি।'

'আমিও দিয়েছিলাম। আমি তা জানি। আমার জীবনে সে একটা প্রকাণ্ড ভুল হয়েছিল। তখন বুঝিনি, এখন বুঝতে পারছি। দিনে-দিনে তিলে-তিলে বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আমি যদি খিদেয় মরতে বসতাম এখানে এই পথের পাশে, তবে আমাকে তুমি ভিক্ষা দিতে ?'

'জানি না। হয়তো দিতাম। ক্ষুধায় মরতে দেখলে হয়তো দয়া হত। জানি না। কিন্তু আপনি তো আর বসেন নি মরতে।'

'সংসারে লোকে কি মরে শুধু এক ক্ষুধাতেই ? আমার ক্ষুধার যন্ত্রণাটা কি কিছু কম ?'

'পেটের ক্ষুধার তুলনায় কিছুই নয়। আত্মার ক্ষুধাটা হচ্ছে বিলাস, আনন্দলীলা। এক রকমের সম্ভোগ। কার সঙ্গে কার তুলনা !'

সেবা হাঁটতে লাগল তাড়াতাড়ি করে। পাশে-পাশে চলতে লাগল বারিধি।

'আপনি কোথায় চলেছেন ?' সেবা ঝিলকিয়ে উঠল।

'তুমিই বা পালাচ্ছ কার থেকে ?'

'পাপের থেকে পালাচ্ছি।'

'কিন্তু খিদের থেকে পালাতে পারছ কই ? চলেছ যে হনহন করে, কী নিয়ে চলেছ তোমার অভুক্ত স্বামীর জন্যে, শ্বশুর-শাশুড়ির জন্যে ? রামায়ণ-মহাভারত তো ওদিকেও ছিল।'

'চাল এখনো আছে খানিকটা—' শূন্য দৃষ্টিতে সেবা একবার তাকাল থলের মধ্যে।

'এক গ্রাস করেও সব্বাইর হবে না। শোনো, দাঁড়াও। আমি তোমাকে চাল দেব।'

'চাল ?' নিজেরো অলক্ষ্যে সেবা দাঁড়িয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, যত চাও। মজুত আছে আমার কাছে। যদি বলো তো, পাঠিয়ে দিতে পারি এক বস্তা।'

সেবা হাঁপাতে লাগল। যেন সে আর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। প্রচণ্ড ভারের পেষণে ভেঙে নুয়ে পড়ছে, থেঁৎলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। চাল। চালের পাহাড়। থালা-ভরা তাল-তাল ভাত। লোভ-উজ্জ্বল উন্মুখ কতগুলি চক্ষু। লালাক্লিন্ন কতগুলি মুখবিবর। সর্বোপরি সেবার আত্মলব্ধ জয়গৌরব। তার প্রতিষ্ঠার সাফল্য।

অনেক টালমাটাল করে সামলে নিয়েছে সেবা। বললে, 'না, দরকার নেই।'

'বাজে বোকো না।' আত্মীয়ের মত করে ধমকে উঠল বারিধি 'তোমার চালের দরকার নেই ? তুমি কি পাগল ? ঘরে এতগুলি অভুক্ত প্রাণী তোমার মুখ চেয়ে বসে অছে, তবু তুমি ফিরবে খালি হাতে ? ফিরতে ভাল লাগবে তোমার ?'

'চাল—আপনার চাল আমরা নেব কেন ?' সেবা তাকাল প্রায় মূঢ়ের মত।

'চাল যারই হোক, চাল তো বটে। চালের মালিক অবাঞ্ছিত হতে পারে, কিন্তু চাল তো অবাঞ্ছিত নয়।' বারিধি সঙ্গে-সঙ্গে চলল আরো কয়েক পা, পদক্ষেপগুলি যদিও এখন মন্থরতর : 'এ চাল ফিরিয়ে দেবার তোমার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই।'

'কত লোকই তো পায়নি। কোনো দিন পাবে কিনা তাও জানে না। খালি-হাতে তারাও তো এক সময় ফিরে যাবে। তারাও তো বসবে গিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি।'

'কিন্তু তুমি ভরা-হাত ইচ্ছে করে খালি করছ। পাওয়া জিনিস সাধ করে ফেলে দিচ্ছ মাটিতে। তোমার সংসারের লোকদের বাঁচাবার সুযোগ পেয়েও বাঁচাচ্ছ না তাদেরকে। এক পাপের থেকে উদ্ধার পাবার ওজুহাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছ আরেক পাপে, গভীরতর পাপে। কতগুলি নিরীহ দুর্বল প্রাণীর তুমি অকারণে মৃত্যু ঘটাচ্ছ। তোমার বিবেকে এসে লাগছে এখন হত্যার কলঙ্ক।'

'না, না-খেয়ে মরব, তবু আপনার থেকে নিতে পারব না চাল।' সেবা রূঢ় ভঙ্গিতে স্পষ্ট দাঁড়িয়ে পড়ল।

'তুমি নিজেই বুঝতে পাচ্ছ, কোনই কৃতিত্ব নেই এই অস্বীকারে।' বারিধিও দাঁড়াল তার ভঙ্গির স্পষ্টতায়: 'আমি তোমাকে নগদ টাকা দিচ্ছি না, চাল দিচ্ছি।'

'জানি। কিন্তু বিনা দামে দিচ্ছেন না।'

'বিনা দামে দিচ্ছি না?'

'না। এ দেওয়ার পিছনে আছে আপনার ক্ষতিপূরণের লালসা। আমাদের গ্রাস আচ্ছাদন করতে গিয়ে নিজের গ্রাস রেখেছেন উদ্যত করে। নিজেদের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে আপনার ক্ষুধাকে আমরা প্রশ্রয় দিতে পারবো না, কিছুতেই না।' সেবা আবার পা চালাল।

'শোনো, দাঁড়াও।' বারিধি আবার তার পিছু নিল: 'দাম অবিশ্যিই চাই, কিন্তু অত ছোট করে দেখ না আর আমার চাওয়াটাকে। এক দিন যে-দাম দিতে চেয়েছিলে সেই আমার সত্যিকারের দাম। শুনে রাখ, বলতে আমার দ্বিধা নেই, তার নাম প্রেম।' পাশাপাশি চলতে লাগল দু' জন: 'এক দিন তার মান রাখতে পারিনি তাই সে অমন নির্মমের

মত প্রতিশোধ নিচ্ছে আজ। তাকে এক দিন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম বলেই সে চিরদিনের জন্য মিথ্যে হয়ে যায় নি।'

'আমি দুঃস্থ বলে আমাকে এমন নির্যাতন করবার আপনার অধিকার নেই।' সেবা কান্নাভরা চোখে বললে।

'আর, তোমারই কি আছে এমন দুঃস্থ থাকবার অধিকার? এমন নির্যাতিত থাকবার? চাল তোমার ফিরিয়ে দিলে চলবে না, কিছুই তোমার ফিরিয়ে দিলে চলবে না। যেখানে তুমি যাচ্ছ সেখানে শুধু একটা কৃত্রিম কৃতজ্ঞতা, প্রেম নেই এতটুকু, সেখানেই পাপ, দারিদ্র্য, মৃত্যু। শোনো, দাঁড়াও—বাঁচবে এসো বাইরে—'

গলির মধ্যে মিলিয়ে গেল সেবা। বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সশব্দে।

১৯

স্টিমারঘাটের রাস্তার দু' পাশে যে সব স্যাকরার দোকান বসেছিল, সব এখন উঠে গেছে। যার যতটুকু সোনাদানা ছিল সব কাগজের টাকায় কিনে নিয়ে পিটটান দিয়েছে তারা। মাঠভরা এখন সেই সোনার ধান। ধানের শ্মশান বলতে পার। দাওয়াল নেই যে ধান কাটে। সব ছারখার ছানভান হয়ে গেছে। সব উলুখাগড়ার দল। মুচিপাড়া তাঁতিপাড়া জেলেপাড়া। জমিহীন দিনমজুরের দল। মুচিদের যারা বেঁচে আছে তারা চলে গেছে কলে কাজ নিয়ে। যদিও গরুর মড়ক চলেছে, পাচ্ছে না আর চালানী চামড়া। পাচ্ছে না রাতে কাজ করার জন্যে কেরাসিন। তাঁতিরা রস চোলাই করে তাড়ি করছে, জেলেরা জল খাটবার জন্যে জাল ফেলে তুলে নিয়েছে কাস্তে। মানুষের কঙ্কালের উপর ফলেছে এবার অপর্যাপ্ত শস্যোচ্ছ্বাস। অস্থিচূর্ণে রসাল সার পেয়েছে এবার।

কম-মজবুত ঘর পড়ে গিয়েছে মুখ থুবড়ে। তেজালো হয়ে গজিয়েছে যত জঙ্গলে আগাছা। এখানে-ওখানে পড়ে আছে কঙ্কাল। কাক-শালিখ পর্যন্ত ভাগাড়ে চলে গিয়েছে। ঝোলা-পেট কুকুর ঘাস খাচ্ছে চিবিয়ে-চিবিয়ে। রাস্তার উপর পড়ে আছে মরা বেরাল। মরা ছেলে।

দালালের নৌকোয় চালান যাচ্ছে মেয়েরা—সমর্থ আর রুগ্ন, যাদের মধ্যে যৌবনের আছে বা এতটুকু উল্লেখ বা অস্তাভা। চালান যাচ্ছে মজুতদারের চাল। চালান যাচ্ছে বেওয়ারিশ কঙ্কালের ছালা। জীবন্ত দেহের দাম ছিল না, দাম হয়েছে পরিত্যক্ত অস্থি-পঞ্জরের।

নিজেদের পার্টি-থেকে-চালানো লঙরখানার ভার নিয়ে পূর্বশ্রী চলে

এসেছে এই গ্রামে, যদুরহাটিতে। দল ভারি করবার জন্যে সম্প্রতি চলে এসেছে বারিধি। কোনো কঠিন সেবা ও কৃচ্ছ্রের আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করবার জন্যে। নিজেকে পরিক্ষালন করবার জন্যে। ক্ষুধার হাহাকারের মাঝে আত্মার হাহাকারকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে।

স্থানীয় জমিদারের কাছারি-বাড়িতে আছে তারা, কর্মীরা। নায়েব-গোমস্তারা রেখেছে তাদের আমিরি আরামে, বিশেষ যখন জানতে পেরেছে তাদের জন্মের কৌলীন্য, সামাজিক উচ্চতা। মহৎ ব্রতোদ্‌যাপনের সংকল্প। ওদের কাজে পালিশ পড়ছে জমিদারের সুনামে। ওদের দিয়ে লাভ বই কোনো ক্ষতি নেই কারুর।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে পুরশ্রী অনেক কাহিল হয়ে পড়েছে, একটা করুণ ক্লান্তি যেন ছায়া ফেলেছে তার শরীরে। মর্মের কোন অদৃশ্য কুহরে যেন জমে উঠছে দীর্ঘশ্বাস।

সে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে ক্ষুধার কাতরতা দেখে নয়, ভিক্ষার কাতরতা দেখে। তারাও সবাই বসে আছে এই ভিক্ষুকের ভঙ্গিতে প্রতীক্ষা করে। স্বপ্নের কুজঝটিকা সৃষ্টি করে। তারাও সেই দিন-গোনার দলে, ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র সেঁচার, নখে আঁচড়ে পাহাড় ক্ষয়াবার। এটা হলে ওটা ঘটে, ওটা ঘটলে এটা হয়—এই নিষ্ক্রিয় বিশ্বাসই শুধু তাদের সম্বল। শুধু বিশ্বাস করা ছাড়া আর কী করবার আছে? ঝড়ের রাতে বিশ্বাসের আলোটুকু রেখেছি বাঁচিয়ে—এই উদ্‌ঘোষণ ছাড়া আর আছে কি বলবার? এই পূর্ববর্তী চুক্তি পরিপূর্ণ না হলে ভবিষ্য সাফল্য অসম্ভব—এই অসম্ভব সর্তের অন্তরালে আত্মগোপন না করে থেকে উপায় কি এখন।

কি কাজ করছি আমরা? ভঙ্গি তৈরি করছি। এখন বাঁকিয়ে দিচ্ছি প্রথমে, পরে না-হয় আসবে সতেজ তীক্ষ্ণতা। কিন্তু এই বাঁকানোটাই কি আরামে নোয়ানো নয়? বড্ড বেশি ইঞ্জিচেয়ারের

আলস্য। ভঙ্গিমানের ভঙ্গি। কর্মটাই বড়, বিরতিটা কিছু নয়? স্তব্ধতাটা বুঝি মুখরতা নয় কখনো? তেমন কিছু একটা দর্শনীয় না হলে বুঝি বড কাজ হল না? দর্শনীয় না হোক, স্পর্শনীয় তো অন্তত হবে। কোথায় সেই স্পর্শ? কোথায় সেই স্পর্শমণি?

শুধু ঈর্ষা আর ঈর্ষা। অবজ্ঞার বদলে ঈর্ষা। ধনীর অহংকার যেমন অসহ্য তেমনি অসহ্য এই গরিবের বিদ্বেষ। এই দরিদ্রের দীনতা, চিত্তদীনতা। দোষ কার? ধনীর? না, ধনবণ্টনব্যবস্থার। তবে ধনীকে কেন প্রহার করি? সেই ব্যবস্থার দোষেই তো সে স্বার্থপর, সঞ্চয়বিলাসী। ব্যক্তির দোষ কোথায়? দোষ ব্যবস্থার। তেমনি গরিবের গুণগানের মধ্যে গৌরব খুঁজি কেন? সেই একই ব্যবস্থার দোষে সে পরশ্রীকাতর, সংকীর্ণচিত্ত। তার নিজের দোষ নয়। দোষ সেই সমাজনিয়মের। সেই নিয়মের বিরুদ্ধে লড়ছি না বলতে চাও? এই যে চিন্তা করছি এই তো আমাদের লড়া। ধীর জলই পাথর কাটবে এক দিন।

সাত নকলে আসল না খাস্ত হয়। আদর্শ যেন না তুচ্ছ দেখায়, তার প্রতিভূরা আজ অক্ষম ও অধম রয়েছে বলে। ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢুকেছে বলে ঘোড়ার যেন না নিন্দা করি। খোঁটার জোড়ে মেড়া লড়ে—এ দুর্বলতা যেন ঘুচে যায় একদিন। দল-বদলানো বেকার, নাস্তিমান কেরানি-কর্মচারী আর বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর দল—এদেরো স্পর্ধা যেন নরম পড়ে। সুবিধাবাদীদের যেন বাদ পড়ে সুবিধা। সাত ভাই তাঁত বুনতে-বুনতে যে-যার শুধু আপন কোলের দিকে টানছে এ যেন না দেখতে হয় আর। ফকিরে-ফকিরে ভাই ভাই, ফকিরের রাজত্ব সব ঠাঁই—এ যেন শুধু ফকিরের রাজত্বই না হয়। শুধু নিঃস্বতার ভিত্তির উপরেই না নিষ্ক্রিয়তার মন্দির গড়ি। সোনার দাঁড়ে না কাক বসাই।

ব্যক্তি দিয়ে না ব্যবস্থার বিচার করি। শাস্ত্র যেন না উলটো

বুঝি ভুঁইফোঁড় ব্যাখ্যাকারের মূর্খতায়। হাতের শাঁখা না দোকানের দর্পণে দেখতে হয়। বিদেশের কুকুর না হয়ে যেন স্বদেশের ঠাকুর হই। হাটের কলা না নৈবেদ্যায় নম করি।

'দুর্ভিক্ষটা না এলে আমরা কি করতুম বলুন তো?' পুরশ্রী জিগগেস করে বারিধিকে।

'যখন এলই, তখন তাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে কেন? এক ক্ষুধার সমতলে মিলতে পারছি আমরা, ছুঁতে পারছি অভাজন জনগণকে। অভিশাপের বেশে আশীর্বাদ বলতে পারেন। যুদ্ধ কাকে বলে জানি না, কিন্তু একজনের সমূহ ক্ষুধা যদি মেটাতে পারি, তবে সেটাতে পাই সেই যুদ্ধজয়েরই আনন্দ।'

সময়ের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরবার কাজ নেই, শুধু সময়ের হাতে ছেড়ে দিই নিজেকে।

তাড়াতাড়ি করলেই খেয়াঘাটে গড়াগড়ি দিতে হবে। তাই দাঁড়িরা দাঁড় না টানলেও দেখতে পাব ঘাটের নৌকো আর ঘাটে পড়ে নেই। সময়ের স্রোতেই টেনে নিয়ে যাবে আমাদের। উজিয়ে যাবার দরকার কি, ভাটিয়ে যাবার দিন এই এল বলে।

ঈশ্বর, আদর্শ না ম্লান হয় কোনো দিন। বাঁশি হারিয়ে না শেষে এক দিন শিঙ্গায় ফুঁ দিই। শুধু তিলক কেটেই না বৈষ্ণব সাজি। অন্যের পোড়া ঘরের পাশে বসে না আগুন পোহাই। আজকের যা আবর্জনা, তা শুধু সার হোক মাটিতে। টবে-পোঁতা ধার-করা চারা না হয়ে সারালো মাটিতে গজাক এবার সত্যিকারের তেজালো গাছ, মেলে দিক তার বিপুল ছায়াচ্ছদ। এই আশ্বাসেই শুধু আশ্রয় খুঁজি।

'আমি ক' দিন ঘুরে আসি বাইরে।' পুরশ্রী বলে প্রায় অপরাধীর স্বরে।

'তাই যান। শরীরটা আপনার ভাল নেই।' সকল কথার মত এ কথাতেও বারিধি সম্মতি দেয়।

'আপনি ? আপনারো তো শরীর খুব ভাল দেখাচ্ছে না।'

'ঠিক ধরেছেন। কোথাও জায়গা পাচ্ছি না এমনি শুধু মনে হচ্ছে।'

'তবে আপনিও চলুন না।'

'যদি বলেন তো যাই আপনার সঙ্গে।'

সমস্তটাই শুধু ক্ষুধা আর ক্ষোভ নয়। কাদা আর ক্লেদ নয়। সমস্ত স্বপ্নই নয় দুঃস্বপ্ন। এত সত্ত্বেও পৃথিবীকে সুন্দর বলে অনুভব করবার লগ্ন বিদায় হয়ে যায়নি। আছে গান, আছে বাজনা। নরম আলো, নরম সাহিত্য। ভাল খাওয়া, গা-ডোবানো বিছানা। স্নায়ু আর স্নিগ্ধতা। প্রকৃতির শান্তি। দেশভ্রমণের আরাম। উচ্চ চিন্তার আলস্য। কেন এ-সব বাদ দেবে জীবন থেকে ? চিন্তাই যখন তূনীর আর ভঙ্গিই যখন আয়ুধ, তখন আর কষ্ট করে ভেক নেয়া কেন ? দলের খাতায় নামটা শুধু লিখে রাখলেই হল।

'ওয়াক, থু, খাব না, খাব না এ-সব।' কে একজন থুতিয়ে উঠল : 'যত সব বাজে বিচ্ছিরি খেতে দেয়া—'

'বা, ও তো খিচুড়ি।'

'তোমার মাথা! বেনের কাছে তুমি মেকি চালাচ্ছ ? এ হচ্ছে শুধু দলকচুর ঘ্যাট। এমনিতে না খেয়ে মরতাম, এখন অপবাদ হবে যে পেটের অসুখ হয়ে মরেছি। না, খাব না, খাব না আমি।' লোকটা অথচ না খেয়ে পারছে না।

দৃশ্যটা চোখে পড়ল বারিধির। যখন তারা যাচ্ছে পারঘাটের দিকে। একজনের সমূহ ক্ষুধা যদি মেটাতে পারি, তবে সেটাতে পাই যুদ্ধজয়েরই আনন্দ। কথাটা মনে পড়তেই বুকের কাছে ধাক্কা খায় সে একটা। মনে পড়ে, শুধু এক জন ক্ষুধার্ত মুখে উপহাস করেছে তার উদ্যত অন্নের উপহার।

২০

হীরেন খাস্তগির প্রথমে চিনতে পারেননি। কদাকার কঙ্কালসার চেহারা। ডিমে রোগা।

'এখানে কি ? এখানে না। যাও নিচে, গেটের বাইরে।' গোঁফ ফুলিয়ে হাঁকার দিয়ে উঠলেন।

'আমি আজকাল সাবান বিক্রি করছি।'

গলার স্বরে হীরেন বাবুর দৃষ্টিটা যেন একটু নরম হল। যেন বা চিনতে পারলেন। বললেন, 'তা বেশ, ভালই করছ। ব্যবসা করছ। তিল কুড়িয়েই তাল হয়।'

'আর তাল গুঁড়িয়েও তিল হয় এক দিন। যদি কিছু নেন।'

'মাপ করো, ও সব দিশি সাবান আমি মাখি না। স্বদেশী করে গায়ে ফোস্কা ফোটাবার আমি পক্ষপাতী নই।'

'কিন্তু যদি নেন দয়া করে, আমার গায়ে তবে কিছু মাংস ফুটতে পারে।'

একটা খনখনে কাশি উঠতেই হীরেনবাবু তাকালেন সুজনের মুখের দিকে। চোপসানো, তোবড়ানো মুখের দিকে। বললেন, 'তোমার কোনো অসুখ ?'

সুজন ফ্যাকাসে চোখে হাসল। বলল, 'না, অসুখ কোথায় !' বাঁশের আগালের মত সরু-সরু আঙুলে শূন্য একটা চেয়ারের পিঠ ধরে ফেলে তার দাঁড়ানোয় একটু জোর আনলে।

'দেখ, সাবান-টাবান আমি রাখব না। তবে তুমি যখন দুঃস্থ হয়ে

পড়েছ, তখন তোমাকে আমি স্বচ্ছন্দে কিছু সাহায্য করতে পারি।' হীরেন বাবু ড্রয়ার টেনে মনিব্যাগ বের করলেন।

ফোকরের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়েছেন, সুজন বলে উঠল, 'আমি দাম চাই, ভিক্ষে চাই না।'

'না, না, দাম হবে কোত্থেকে? ও জিনিস আমি ব্যবহারই করতে পারব না।'

'ব্যবহার নাই বা করলেন। কিনে বাইরে ফেলে দিলেন না হয় ছুঁড়ে। আর পয়সা যদি দানই করতে চান আমাকে, আমিও না হয় আপনাকে আমার সাবান দান করলাম।'

'মিছিমিছি অপচয় আমি পছন্দ করি না।' হীরেনবাবুর মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত হল।

'শুনে সুখী হলাম। কিন্তু আমাকে একবার সেই অপচয়ের সুযোগ দিন না জীবনে।'

'দেখ, বেশি বকবার আমার সময় নেই। নাও এই দুটো টাকা, আর ফিরিয়ে নিয়ে যাও তোমার সাবান। তোমার তো তাতে-লাভই হবে। পয়সাও পেলে, জিনিসও থেকে গেল। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। ব্যবসা করতে বসে এমন দাঁও ছাড়তে নেই।'

'ও নিলেই আমি হেরে গেলাম।'

'হেরে গেলে?'

'হ্যাঁ, আমার বাঁচার মধ্যে যে ন্যায় আছে, আমার জীবনে যে আছে মূল্য, তা আমি অনুভব করতে চাই। মরে গেলেও আমি ভিক্ষে চাইতে পারব না। নিন না দাম দিয়ে কিনে।'

'কি আশ্চর্য, ব্যবহার করি না, তবু এ আমাকে কিনতে হবে?' হীরেন বাবু এবার ধমকে উঠলেন।

এমন সময় পুরশ্রী সে-ঘরে এসে ঢুকল। শান্ত স্বরে বললে, 'আমার

ঘরে চলুন, আমি কিনব ও-সাবান। দিশি সাবান মাখতে আমার ভারি তৃপ্তি লাগে। পবিত্রতার স্পর্শ পাই।'

সুজনকে পুরশ্রী তার নিজের ঘরে নিয়ে এল। বেশ সাজানো-গোছানো ঘর, আর বেশ একটু হাতের যত্নে চোখের আদরে সাজানো। ঘরের সুরটা গদ্‌গদ। আগে দু' একবার এসেছিল সে পুরশ্রীর ঘরে। তখন কেমন যেন একটা রিক্ত কাঠিন্য ছিল। আসবাব-পত্র ছিল কম, এলোমেলো। বিছানাটা এমন উন্মোচিত ছিল না। তখন ঘরে ছিল পালাই-পালাই ভাব। অস্থির-চপলতা। এখন যেন এসেছে গা-হাত-পা মেলে বিশ্রামের ভঙ্গি।

শুধু ঘরে নয়, শরীরেও। সচেষ্ট হয়ে সাজলে তাকে যে খুব সুন্দর দেখায়, পুরশ্রীর যেন এত দিনে এসেছে সেই চেতনা। তার শরীরের রুক্ষ দীর্ঘতাকে যে লীলায় নমনীয় করা যায় সে যেন শিখেছে সেই ইন্দ্রজাল। সেই জ্বালামালিনী মেয়ে কেমন যেন এখন ছায়াকামিনী হয়ে উঠেছে। খটখটে রোদের উপর নিয়ে এসেছে ঠাণ্ডা কালো মেঘ। হীরেন খাস্তগিরের বরখাস্তর দিন দিয়েছে পিছিয়ে। ঘড়ির কাঁটা দিয়েছে বাঁয়ে ঘুরিয়ে।

'এ আপনার হয়েছে কি?' সুজনকে কৌচে বসিয়ে তার মুখোমুখি আরেকটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে পুরশ্রী জিগগেস করলে। তার প্রশ্নে শুধু চঞ্চল কৌতূহল নেই, আছে একটি বা অচঞ্চল বেদনা।

সুজন খুব সংক্ষেপে সেরে দিল ইতিহাসটা। খুব মামুলি ভাবে। বাবা ক'দিন আগে মারা গেছেন, মাও মর-মর। কিছুতেই নতুনত্ব নেই। তার চাকরি গেছে, রোগ ঢুকেছে শরীরে। এটাও নেহাৎ মামুলি। আরো দু' একটা যদি দুর্ঘটনা ঘটে, কোনোই তাতে চমক থাকবে না। সেই একই মুখস্ত-করা রাস্তায় একচক্র প্রদক্ষিণ।

পুরশ্রী অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল সুজনের দিকে। খেয়াল হল যখন কথা শেষ করেও তার দিকে সুজন ফিরে তাকাল না।

পুরশ্রী এ কি দেখছে ? দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ দুঃস্থিতি ? মাত্র একটা বেকার জীবনের পরিণাম ? শুধু খেতে না পেয়ে রোগে ভুগে মরার অনিবার্যতা ? বড় জোর একটা নিরুদ্ধ অভিযোগ, স্থূলস্ফীত অভিমান ? না, আর কিছু ?

'চলুন, আমরা কোথাও চলে যাই।' পুরশ্রীর গলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল কথাটা। যেন অনেক দূর থেকে কে গান গেয়ে উঠল। অনেক দূর থেকে।

পুরশ্রী যখন ফিরে এল তার গ্রামের কাজ থেকে, রুক্ষ ভঙ্গিটা মোলায়েম করে, ধুলোবালি মুছে ফেলে শরীরে আলস্যলালিত লালিত্য নিয়ে, আর তার পিছে-পিছে তার ঘরে এসে ঢুকল যখন বারিধি, জমিদারের ছেলে, তালুক-মুলুকের ওয়ারিশ, তখন জামার হাতায় মুখ ঢেকে হীরেনবাবু হেসেছিলেন একটু লুকিয়ে। সে-হাসিটা বিছের কামড়ের মত বিঁধে আছে পুরশ্রীর বুকের মধ্যে। যেন সেই হাসিতে তার হারটাকে বিজলী আলোর সূচ ফুটিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বা অপরপক্ষের উন্মত্ত হাততালি। সেই থেকে তারই অহেতুক প্রশ্রয়ে হীরেনবাবু তার প্রতি অজস্র-উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বারিধির অভ্যর্থনায় হলেন অবারিত, উৎসুক-উৎফুল্ল। ব্যবস্থা করলেন নানান ছাঁদের পার্টি নানান ছাঁদের ঘটাটোপ। খেতে-খেতে লোভ ও কাঁদতে-কাঁদতে শোকের মত বলতে-বলতে বিয়েটা প্রায় সাব্যস্ত করে ফেললেন। বারিধিকে এমন কি বললেন পর্যন্ত যে, আসল মিলন ঘটে আদত সমধর্মিতা থেকে, সমকর্মিতা, সমব্রতিতা থেকে, এক কথায়, কমরেডশিপ থেকে। বারিধি দিব্যি মাথা দোলাল। সমস্ত কিছু চাবুকের বাড়ির মত লাগছে তার গায়ের উপর। অন্তরজ্বলুনির মত। ভাবল, এই বার সে প্রতিশোধ নেবে। ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙবে এবার।

'চলুন, বাইরে চলুন কোথাও।' স্পষ্ট, সাদামাঠা গলায় বললে পুরশ্রী।

'কোথায় ?' সুজন তাকাল এবার নিস্তেজ চোখে।

'চেঞ্জে। সুসময় থাকলে ইউরোপে চলে যেতুম। ইদানিং, সোনার বাঙলার বাইরে, অন্তত যেখানে মানুষের হাতে-তৈরি মৃত্যুর খেলনা বিকোচ্ছে না বাজারে।'

'পালিয়ে যাব বলতে চান ?'

'পালিয়ে যাবেন মানে।'

'এখানে আমি যুদ্ধ করছি না ?'

'যুদ্ধ করছেন ? কী যুদ্ধ ?'

সুজন হাসল: 'জীবনযুদ্ধ।' তাকাল তার শিরালো, শীর্ণ হাতের দিকে।

শুধু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল পুরশ্রী। বললে, 'পালানোটাও এক প্রকারের রণনীতি। যুদ্ধ করাটাই শুধু বাহাদুরি নয়। পালিয়ে শক্তি সংগ্রহ করে এসে শত্রুকে যদি শেষে হারানো যায়, তবে সেটাকেই বলব বীরত্ব।'

'আমার যুদ্ধনীতি সে রকমের নয়।' সুজনের গলা দৃঢ়তায় গম্ভীর হয়ে এল: 'আমি নড়ব না, সরব না, হটব না কোনো দিন। এই প্রতিজ্ঞায় আমি অটল থাকব। প্রাণ দেব, কিন্তু মান দেব না, মনুষ্যত্বের যা মান—'

পুরশ্রী স্থির বিশ্বাসে হাত রাখল সুজনের হাতের উপর। বললে, 'কথাটাই শুধু বড় হল, কিন্তু ফলটা বড় নয়।'

'বড় নয় ?' হাসল সুজন: 'এক শ্রেণী থেকে আরেক শ্রেণীতে চলে আসছি, ইস্কুল মাস্টার থেকে ফিরিয়ালা, চলে আসছি শ্রেণীহীনতায়, ফল বড় হল না ?'

'না,' হাত ধরে নাড়া দিল পুরশ্রী, 'আপনি জানেন না, কী ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে আপনার স্বাস্থ্য। এখানে এমনি করে আর কিছু দিন থাকলে আপনি মরে যাবেন।'

'হয়তো মরে যাব, কিন্তু তবু আমরা মরব না কোনো দিন।'

'না, আপনি চলুন। আমাকে নিয়ে চলুন।'

'কোথায় যাব? কোথায় নিয়ে যাব? সুসময়ের ইউরোপের কথা বলছিলেন না, কিন্তু আমি দেখছি এক কঙ্কালধবল পৃথিবীর মরুভূমি। পৃথিবীতে যাবার কোথাও জায়গা নেই।'

'না, আছে। জায়গা আছে। এখনো আছে চাঁদ, আছে শিশু, আছে রাত্রির ভোর হওয়া।'

'বিশ্বাস করি না। শুধু আছে যুদ্ধ, আছে হিংসা, আছে বলি।'

'না, আপনি চলুন। আপনিও বাঁচুন, আমাকেও বাঁচতে দিন।' পুরশ্রী তার স্পর্শে আরো ব্যাকুলতা চাইল সঞ্চারিত করে দিতে।

স্পর্শটা অস্বীকার করবার মত তার নির্দয়তা নেই, কিন্তু তাতে চঞ্চল না হবার মত আছে তার নিস্পৃহতা। তাই সে সহজ স্বরে বললে, 'একা-একা যাই কি করে?'

'একা-একা?'

'ভুলে যাননি নিশ্চয়ই, আমার স্ত্রী আছে, ছোট ভাই-বোন আছে, মুমূর্ষু মা আছে—তারা যাবে কোথায়?'

পুরশ্রী সামলে নিল মুহূর্তে। বললে, 'তাদের আমি ব্যবস্থা করে দেব। মাস-মাস, যদ্দিন না আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন, তাদের আপনি মাসোয়ারা পাঠাবেন।'

'তবু একা-একা বাঁচব আমি স্বার্থপরের মত?' প্রশ্নে এতটুকু রাগ নেই, যেন বা প্রচ্ছন্ন কাতরতা।

'এই স্বার্থপরতা অত্যন্ত বড় জিনিস। জীবনের প্রাবল্যের প্রমাণ। এ তো আপনিও জানেন। মৃত্যু যত কাছে, স্বার্থপরতাটা তত দুর্দান্ত। এমন সময় আসে যা পর্যন্ত ছেলের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় স্বচ্ছন্দে। তা

ছাড়া, শুধু একা আপনিই কি বাঁচছেন—' পুরশ্রীর স্তব্ধতাভরা আয়ত চোখ ঢেকে নিল সুজনের দৃষ্টিকে : 'আমাকে বাঁচাচ্ছেন না ?'

এক দিগন্ত ছুঁয়ে আছে সমুদ্র, আরেক দিগন্তে প্রান্তরের প্রান্ত আছে লীন হয়ে। উদ্বেল উদধির পরে শক্ত স্থির ভূমির শান্তি। মুহূর্তের জন্যে সুজন এক ধূসর শূন্যতার বদলে এক আশ্চর্য উন্মুক্তি দেখল। মুহূর্তের জন্যে। মন আবার ফিরে এল কঙ্কাল-করোটির দেশে। পুরশ্রীর হাত আস্তে সরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'পারব না।' শোনাল বিদ্রোহবাণীর মত নয়, রণধ্বনির মত নয়, কাতরোক্তির মত।

পাখা ঝাড়া দিয়ে পাখি উড়ে গেল কুলায়ে, বৃক্ষচূড়ে।

'বসুন।' পুরশ্রী উঠে দাঁড়াল। তার ঋদ্ধিমান ঋজুতায়। চলে গেল ঘর ছেড়ে।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেতে করে খাবারের প্লেট ও জল পাঠিয়ে দিল সে বেয়ারার হাতে। নিজে এল পিছু-পিছু। তার উদ্ধত নির্লিপ্তিতে. বললে, 'খান।'

রাশীভূত খাবার। চেয়ে থাকতেও আশ্চর্য লাগে।

পুরশ্রী আবার মনে করিয়ে দিল।

শুষ্ক রেখায় হাসল একটু সুজন। বললে, 'ভরাডুবির মুঠো লাভ বোধ হয় ?'

'জানি না। লাভ-লোকসানের হিসেব করতে ভুলে গেছি। নিন, খান।'

'খিদে নেই।'

'খিদে নেই ?'

'রুচি নেই। যা খাদ্য তার অতিরিক্তে লোভও নেই, স্পৃহাও নেই।' সুজন উঠে দাঁড়াল। বললে, 'সাবান নেবেন বলেছিলেন—'

'হ্যাঁ, আছে কতগুলি ?' পুরশ্রী যন্ত্রস্পন্দিতের মত বললে।

কতগুলি ? মাত্র ডজনখানেক আছে। টুকরো পাঁচ আনা করে, ডজন হিসেবে সাড়ে তিন টাকা। যতখানা তার দরকার।

পুরশ্রী সবগুলিই কিনে নিল। সাড়ে তিন টাকার বেশি দিতে পারল না।

সুজন বস্তিতে ফিরে এসে সেবাকে দেখাল তার উপার্জন। এক সঙ্গে সাড়ে তিন টাকা। কল্পনা করতেও শিহরণ হয়।

'কি করবে এ দিয়ে ?' সেবা জিগগেস করলে হতবুদ্ধির মত।

'কি করব মানে ?' সুজনও প্রায় বিমূঢ়।

'আমি বলি কি, যা লাগে আগে মার জন্যে ওষুধ নিয়ে এস। সেই পুরোনো প্রেসক্রিপশানটা পাওয়া গেছে খুঁজে। আগের সেই ব্যথাটাই উঠেছে চাড়া দিয়ে।'

'হ্যাঁ, সেই পুরোনো প্রেসক্রিপশান মতই ওষুধ আনব। সেই এক এবং অদ্বিতীয় ওষুধ। আর তার নাম হচ্ছে ভাত। ব্যথা যদি সারে, ওতেই সারবে।'

এত দিন লঙরখানা থেকে চলেছে। জগদ্ধাত্রী পর্যন্ত তাই খেয়েছেন। খিদের চোটে পাটকেলেই কামড় পড়ে, এ আর বেশি কি। আজ যদি দুটি চাল পায়। আলোচালে সাধ নেই, খুকড়ি চাল হলেও চলে যায়।

বিকেলবেলা কনট্রোলের ফের দোকান খুলবে। সেবা তুলে নিল সেই রেশনের থলে। থাকবার মধ্যে ওটাই শুধু আছে। জায়গায়-জায়গায় কাপড়ের পাড় দিয়ে সেলাই করা। ইঁদুর তার খিদে মেটাতে দাঁত বসিয়েছে এই থলেতে। সোনার উপরে মিনের কাজ করা।

সুজন বললে, 'আমি যাই।'

'তুমি সকালবেলা টহল দিয়েছ অনেকক্ষণ। এবেলা তুমি জিরোও। শরীর যদি ভাল বোঝ, সন্ধের দিকে না-হয় বেরিয়ো সাবান নিয়ে।'

সুজন অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেবার দিকে। আগে-আগে এ রকম চাউনিতে সেবা একটু সলজ্জহর্ষ অনুভব করত। এখন আর তাতে

রেখা পড়ে না। এখন সে সমর্পিত, প্রস্তরলিখিত। তাকে এখন কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই। নদীকূলে বাস করলেও তার আর ভাবনা নেই কাণাকড়ির। সর্বশেষ সর্বনাশের জন্যে সে প্রস্তুত।

নদী শুকিয়ে রেখা হয়ে গেছে সেবা। রিক্ততার শুকনো হাওয়ায় ঝরে গেছে যৌবনের পত্রভার। পরনের কাপড়টায় জায়গায়-জায়গায় খাবল মারা, প্রমাণের প্রায় আদ্ধেক। টেনে-বুনতে কুলোয় না। বুক-পিঠ ঢাকা যায় না এক সঙ্গে। বুক-পিঠ ঢাকতে গেলে কোমরে ফের বেড আসে না, নামতে চায় না গোছের নিচে। তাল-ছাঁকার বাঁখারির চালুনির মত পাঁজরগুলি ফাঁক-ফাঁক হয়ে রয়েছে, কণ্ঠার হাড় নামা জমির আলের মত রয়েছে উঁচিয়ে। গাল তুবড়ে গেছে, বুক গেছে চুপসে, কোমর গিয়েছে ধসকে। গায়ে খড়ি উড়ছে, চুল উঠে যাচ্ছে, জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বাঁধনি-বলনি সব ঢিলে হয়ে গেছে। গা-ময় চুলকুনি উঠেছে। ছোট-ছোট নখের ভিতরে মাটি, দাঁতের গোড়ায় নীলচে দাগ ধরা।

আছে শুধু দুটি ভাসা-ভাসা ভাবতরল চোখ।

তার জন্যে এত!

দিগন্তে বর্ণ-বিদীর্ণ সন্ধ্যা, সবুজ সমুদ্রে চাঁদের মুক্তস্নান, স্তব্ধ মধ্যাহ্নের মন্থর মদিরা—একবার এসে ডাক দিল সৃজনকে। শৃঙ্গারপূর্ণ ভৃঙ্গার ছেড়ে সে আছে এ কী কাঠের পুত্তলী নিয়ে! সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দিচ্ছে কি পেয়ে? এ শুধু একটা মমতা ছাড়া আর কি! শুধু একটা সেকেলে বিবেকদংশ। একটা জান্তব স্নেহ। আশ্চর্য, মমতা প্রেমের চেয়ে বড় হবে? মৃত্যু হবে জীবনের চেয়ে বলবান? আত্মার আর্তনাদের চেয়ে জঠরের যন্ত্রণা হবে অপ্রতিরোধ্য?

'জানো সেবা, তোমার আরেক নাম লক্ষ্মী।' সৃজন ছুঁলো সেবাকে।

'লক্ষ্মী?' অনেক দিন পর সেবার ঠোঁটের ধারে হাসির রেখা পড়ল।

'হ্যাঁ, জান না, স্বামীর হাতে টাকা এলেই স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী হয়ে যায়?'

২১

ফুটপাতে শুয়ে আছে সারে-সারে। কাতারে-কাতারে। ন্যাতা-জোবড়া হয়ে। একেকটা পরিবার। শত-শত পরিবার। মাকে ঘিরে। কেউ বা ছুটকো, দল-ছাড়া। শুয়ে-শুয়ে গোঙাচ্ছে, গোঙাতে-গোঙাতে শুয়ে পড়ছে। গভীর রাতেও কান্নার কামাই নেই, বরং আরও শোনাচ্ছে যেন অতলান্ত। অত রাতেও ভাত চাচ্ছে, ফেন চাচ্ছে, উম্নুনির জলের মত হলেও চাচ্ছে একটু দুধ। বোঝো কী প্রচণ্ড ক্ষুধা। খুদের জাউয়ের বদলে দুধের জন্যে কাঁদছে—বোঝো কী অসম্ভব খিদে তার ছেলের, তার দুঃখের ছেলের। স্তনের বৃন্তে নেই আর এক বিন্দু দুধ।

শুধু মরছে না, প্রসব হচ্ছে এরি মধ্যে। রাস্তায়, আস্তাকুঁড়ের কিনারে। মৃত্যুর শিখরে উদয় হচ্ছে নবাগত শিশুর। অনাগত পৃথিবীর প্রত্যাশায়। বেশির ভাগই পো-পোয়াতি মরে যাচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যে। এরি মধ্যে মা মেয়ের রুক্ষ চুলে বিলি কেটে উকুন বেছে দিচ্ছে। কখন সন্ধে বেলা বাবুর জন্যে রসদ তুলে নিচ্ছে তার দারোয়ান।

অনেকে এর মধ্যে দান-খয়রাতের সুযোগ পেয়েছে। অনেকে পেয়েছে যেমন ঘুসের, নিটমুনাফার। অবিশ্যি এই ঘুস ও মুনাফার অংশ থেকেই খয়রাত। গজিয়ে উঠছে নানা ঢঙের লঙরখানা। ছত্রিশ জাতের একসত্র। তিলি-মালি-তামিলি, সদগোপ-নাপিত-মালাকর, কামার-কুমার-গন্ধবণিক, হাঁড়ি-ডোম-মুচি, জেলে-জোলা-নিকারী—হিন্দু আর মুসলমান সব মিলেছে এক ক্ষুধার অগ্নিকুণ্ডে। এক নির্বাপনের আশায়। এক খাওয়া শেষ না হতেই আরেক জায়গায় খাওয়ার জন্যে ছোটে, পড়ে হুমড়ি

খেয়ে, কাল একবারও খেতে পারবে কিনা নেই তেমন নিশ্চয়তা। খিদের সঙ্গে অন্ন পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না।

খিদের কান্নাটা মুখর, কাপড়ের কান্নাটা নির্বাক। তোমাকে শুনতে হবে না, দেখতে হবে। কিন্তু দেখে এমন সাধ্য কি। বৃষ্টিতে ভিজে গেলে এক আঁচল কোমরে রেখে আরেক আঁচল শুকিয়ে নেয়া যায় না। অনেকে শুধু ঘরের মধ্যে পড়ে মরে রয়েছে। বেরুবার মতও কানি ছিল না বলে। যারা বেরিয়েছে তারা আজ দুঃসাহসিক উদাসীন। অনুপায়, অবিকৃত নগ্নতা। যে নগ্নতা মাংসের আড়ালে কঙ্কালকে দেখায়, লোভের আড়ালে দেখায় ধ্বংসের অনিবার্যতা।

একে অন্ধকার, তায় এই পঙ্কিলতা। কলকতা কলুষিত হয়ে গেল। তার দোকান-পসরা সরাই-চটি গাড়ি-ঘোড়া খেলা-ধুলা সিনেমা-থিয়েটার আমোদ-বিনোদ, সব হয়ে দাঁড়াল ব্যঙ্গের জিনিস। এদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দাও। রোগের আকর, বীভৎসতার প্রতিচ্ছায়া, স্তূপীভূত বাধা, এদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও নিজের-নিজের সরহদ্দে। অবধারিত মৃত্যুর চাকার তলে এদের শুইয়ে রেখে লাভ নেই।

বাঁশের চাড়া দিয়ে ছাদ আর বজায় রাখতে পারছে না সুজন। হেলে পড়েছে অনেক আগেই, এখন ভেঙে পড়ল। অন্নে কাতর ছিল, এখন পাথর হয়ে গিয়েছে।

ব্যারাক-বাড়ি থেকে চলে এসেছে বস্তিতে। বারদুয়ারী বস্তিতে। মা মারা গিয়েছেন। মারা যে যেতে পেরেছেন তাঁর ভাগ্যে তাই সবাই খুসি। একেক জনের প্রাণ একেবারে যেতে চায় না, গলার কাছে এসে আটকে থাকে। কষ্টও আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে দেহটাকে বোবা করে রাখে। নিজেই শুধু শান্তি পাননি, শান্তি এনে দিয়েছেন। মরবার আগেই এটুকুই শুধু ভয় ছিল, চিতা করে পোড়ানো হবে কি না তাঁকে, মুখাগ্নি করতে পাবে কিনা সুজন। শুধু এটুকু বিলাসিতা। কাঁধে নয়, মোটরে করে মা

পুড়তে গেছেন। আর যার মুখে সব সময়ে জলছিল ক্ষুধার আগুন, তার নিভে যাবার পর আবার আগুন কিসের ?

রাজন দূরে এক চাটের দোকানে কাজ পেয়েছে। খোলার বস্তির খোপরিতে-খোপরিতে খুরিতে করে খাবার দিয়ে আসে। খালি-গায়ে হাফ-প্যাণ্ট পরনে। ঘরে-ঘরে মাসি-দিদি বলে। বকশিস কুড়োয়। দরকার হলে মাঝে-মাঝে এঁটো-কাঁটা মুক্ত করে। কখনো-কখনো বা ট্যাক্সির ড্রাইভারের পাশে হাওয়া খেতে বেরোয়, অনুযাত্রী প্রহরী হিসেবে। আগে-আগে বাড়ি ফিরত, বউদিদিকে দিয়ে যেত পয়সা, যখন চা খেয়ে খিদে মারত। এখন আর আসে না। এখন তার মুখে গন্ধ থাকে, খুরিতে করে খাঁটি টানে।

রাজনের দু' বছরের ছোট রাধা, ন-দশ বছরের। আগে ফ্রক পরত, ছোট দেখাত। এখন বাধ্য হয়ে কাপড়ের ফালি পরতে হয়েছে। অনেক ঢ্যাঙা লিকলিকে দেখায়। আদর করা যায় না, জ্বালাতন করা যায় এমনি একটা ঘুরুলি এনেছে চলা ও চাউনির চাপল্যে। বস্তির ছুকরিদের সঙ্গে শোয়া-বসা করে, ফস্টি-নস্টি করে, আস্তাকুঁড়ের ভাষা শেখে, হাবভাব শেখে। ক্ষুধা যেখানে অশাসন, সেখানে থাকতে পারে না কোন শাসন-শৃংখলা, অশ্রাব্য সেখানে আদেশ-উপদেশ। কাছেই আছে একটা অফিস-বাবুদের মেস-বাড়ি, সেখানে পচি-পুনি-কালি-শিবির সঙ্গে সেও হানা দেয়, হামলা চালায়। এ বাবুর পিঠ চুলকে দেয়, ও বাবুর হাঁটু দেয় টিপে, তৃতীয় বাবুর চোখের পাতায় আঙুল বুলিয়ে-বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়। সিকি-আধুলি বকশিস নিয়ে আসে। পচি-পুনি কি রকম টেবিলের থেকে এটা-ওটা তুলে নিয়ে আসে, রাধার তখনো হাত ওঠে না। একদিন একটা দিয়াশলাই সরাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, শাস্তিস্বরূপ আদরের মাত্রাটা বেশি হয়েছিল সেদিন। পচি-পুনি বলে এক দিনেই কি আর পারবি, আতি চোর পাতি চোর হতে-হতে সিঁদেল চোর। রাধা

ছাড়েনি তার বৌদিকে। আহ্লাদে কোনো দিন ডগমগ হয়ে আসে, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদে বা কোনো দিন।

সুজনের সাবান ফেনা হয়ে গিয়েছে মিলিয়ে। সে এখন বিছানা নিয়েছে। বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে বলতে পারো। জ্বর, কাশি, বুকে শত-সূঁচের যন্ত্রণা, কি নয়! কাজ নেই, কামাই নেই, এই যে শুয়ে আছে বিছানায়, উড়তে না পেরেই যে পোষ মেনেছে—এই দাসত্বটাই তার বড় ব্যাধি, বড় কষ্ট। বলে, 'দরখাস্তে নাম দস্তখত করতে পারব না আমি, যাব না আমি খাস্ত-বরখাস্তের দলে। আমি উঠব, লড়ব, গড়ব আমার দেশ, আমার নতুন দেশ, আমি হারব না, নড়ব না, মরব না কিছুতেই। আমাকে মরতে দিও না, সেবা। জয়ী হতে দিও আমার এই বাঁচার স্পৃহাকে। বাসা আমি অনেক ছোট করেছি, কিন্তু আশা আমাকে ছোট করতে দিও না।'

বন্যার মত এসে পড়েছে দুর্দিন, এক মুহূর্তের জন্যেও স্থির জায়গায় রাখতে দিচ্ছেনা পা। রাখতে-না-রাখতেই ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলছে। এখন শুধু খাওয়ার সমস্যা নয়, চিকিৎসার সমস্যা। চাল-বজরা তেল-নুন নয়, নগদ পয়সা। তাও এক-আধটা নয়, মুঠ-মুঠ। রোগের সঙ্গে যুঝতে হবে। যে রোগ ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে। কিন্তু পয়সা কোথায়?

'এ দুর্ভিক্ষে যদি কেউ মরল সেবা, সে হচ্ছে ভগবান। আমরা নয়। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি—উড়ে গিয়েছে এ মন্ত্র। এখন জিভ পেয়েছেন যিনি আহার খাবেন তিনি। চলছে তার যুগ। চলতে দিও না, সেবা। তুমি একা না পারো, আমাকে বাঁচিয়ে তোলো। চাল নেই ধান নেই, কিন্তু গোলাভরা ইঁদুর আমরা দূর করব।'

বস্তির গলিতে ফাঁকে কয়েকটা মেয়ে দাঁড়ায়। কালো ঠোঁটে বিড়ি খায়। হেঁড়ে গলায় সুর ভাঁজে।

গোলাপ-মাসি সেবাকে দাঁড়াতে বলে পাশ ঘেঁসে। ধনেখালি শাড়ি

কিনে দেবে বলে। গন্ধতেল। কোঁমকেলের চুড়ি। ঘর দেবে আলগা। প্রথমে না হয় মাদুর আর টেমি, দেয়ালে ভুসি, পরে ছাপোর খাট, ঝাড়-বাতি, দেয়ালে টানা আয়না। শেষে মঞ্চের মালতী, পরদার তারকা।

স্বামী যার মরতে বসেছে তার আবার সতীপনা কিসের? চালে খড় নেই তার আবার বাড়ির বহর! শুধু ভিক্ষে করে সে স্বামীর চিকিৎসা চালাবে? কে দেবে ভিক্ষে? আর কতটুকু? এক চিমটি নুন দেয় না কেউ, সাবু-বার্লি চিনি-মিছরি দেবে? দেবে তারপরে ওষুধ? কে দেবে তাকে কালো বাজারের সন্ধান? চোর ধরতে চোরকে লাগাবার মত তার মুরোদ কোথায়?

সেই মলই তো খসাবি তবে আর মৃত্যুকে হাসাচ্ছিস কেন? চালুনি করে ঘোল বিলোবি কি করে? তার চেয়ে সোজাসুজি ঝাঁকের কই ঝাকে চলে আয়, বেঁচে যাবি তা হলে। স্বামীর প্রাণের চেয়ে তোর এই সংস্কারটাই বড হল? তারপর কি আর ফিরতে পারবিনে তোর স্বামী-প্রেমের শক্তিতে? সুজনের ক্ষমায় এখনো তোর অবিশ্বাস?

প্রশ্নের উত্তরে উত্তরণের জায়গা পায় না সেবা।

ভিক্ষা দিতে নয়, ভিক্ষা করতেই শেষে পথে বেরোয়। সব সময়েই মনে হয়, বারিধির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। আজ সে কোনো প্রতিবাদ করবে না, যে কোনো দামে যে কোনো জিনিস নেবে বুঝি আঁচল পেতে।

মুখে ঘোমটা টানা, একখানা হাত মেলে ধরা বাইরে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে ঠায় বসে থাকা চুপ করে।

২২

ভিক্ষুকের ছবিটাতে সম্পূর্ণতা আসেনি। সঙ্গে একটা ছেলে চাই।

ছেলে পেলে তার মধ্যে বঞ্চিত, পরাভূত, অপমানিত মাতৃত্বের ছবি ফুটে উঠবে। ছেলে পেলে তাকে আর দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে হবে না। বড়লোকের বাড়িতে সোজা ঢুকতে পারবে তার মাতৃত্বের মর্যাদা রেখে। ছেলে তার মাঝে আনবে সম্মান, দেবে অব্যাহতি।

ছেলে চাই।

পথে অসংখ্য ছেলে গড়াগড়ি যাচ্ছে, একটা তুলে নিলে হয় বুকে। কিন্তু সব মা হুঁসিয়ার। মরবার মুহূর্তের আগে কেউ ছেড়ে দিতে রাজি নয়।

পথের সংসারে বেছে-বেছে মোক্ষমণির সঙ্গে সে ভাব করেছে। মর-মর দেখে। ডাকস্বরূৎ বিঘেটাক জমি ছিল তাদের আগে, গোয়াল-গরু ছিল, গোয়ালে সাঁজালি দিত সে রোজ। ধারে-কর্জে জমিটুকু ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পরে ভানাকুটো করে খেত। আসাঁটা চাল আর হিঞ্চে-কলমি। পরে লাল আলু। আরো পরে দলকচু। মড়ুঞ্চে, মড়াছেঁয়ে, শেষ পর্যন্ত আছে এই ছেলেটা। মোক্ষমণি মরে গেলে ও-ও টেঁসে যাবে। যেন তার মরবার আগে না যায়।

'আমাকে দাও।'

মৃত্যুর মুখে এসে সন্তানের জন্যে মায়াটাও অবাস্তব লাগে। মোক্ষমণি বলে, 'স্বচ্ছন্দে।'

গোলাপ-মাসি তাকে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়েছে, যাতে অন্তত কিছু দৈর্ঘ-প্রস্থ আছে, আছে কিছুটা বা আবরণের পর্যাপ্তি। ছেলে কোলে নিয়ে তার চেহারা অনেক খুলে গেছে। এসেছে তীক্ষ্ণতা, এসেছে বা অভাবের বাস্তবতা। তার ছিন্ন আঁচলের তলায় চোখ পাঠাতে গিয়ে সবাই ছেলে দেখছে। চোখের লালসার উপর এসে পড়ছে বা গাম্ভীর্য, টিক-খর রোদে মেঘের স্নিগ্ধতা।

কিন্তু রাই কুড়িয়ে বেল হচ্ছে না।

একসঙ্গে অনেক টাকা চাই—যাতে অন্তত ডাকসাইটে ডাক্তার আনা যায় একজন। যত দামই হয়, ওষুধ খাওয়ানো যায় ঠিক-ঠিক।

'তুমি আছ, তুমি থাকতে আমি কেন মরব? তুমি হেরে যেও না, তোমার পাশ ছেড়ে পাঠিয়ো না আমাকে হাঁসপাতাল। আমার না-মরার স্বপ্ন সফল হতে দিও।'

বাবুদের বাড়ির দারোয়ান এসেছে সেবার কাছে। আগে-আগে বেছে-বেছে কয়েকটা মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়েছে দারোয়ান। সেই বুঝে ঘাপটি মেরে বসেছে আজ সেবা।

'সন্ধের সময় নিয়ে যাব তোমাকে।'

'কি রকম পাব?'

'আর-আররা তো শুধু খেতে পেয়েছে পেট ভরে। তোমাকে নিশ্চয়ই কিছু দেবে মোটা হাতে। তোমাকে তো প্রায় ভদ্রলোক বলে মনে হয়।'

'তোমার বাবু তো আরো ভদ্রলোক। আমরা তো জানো বাজারের নই—'

'তা জানি না? তাই তো বাবু খাওয়াচ্ছেন তোমাদের বেছে-বেছে।'

'তবু, শ'খানেক টাকা পাওয়া যাবে?'

মনে-মনে মুণ্ডপাত করলেও বাইরে দারোয়ান মুখ খিঁচোলো না। কেননা ভাল জিনিসে তার ভাল মুনাফা। ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'তা বাবুর

মঞ্জি হলে একশো টাকা আর বেশি কি। সে যাই হোক, ছেলেটাকে আর কারু কাছে কিন্তু রেখে এসো।'

'তা না-হয় আসব। কিন্তু দর ঠিক না হলে আমি যেতে রাজি নই। আমার পেঁয়াজ-পয়জার দুই হবে এ আমি চাই না। তোমার বাবুকে পাঠিয়ে দিতে পারো না? কথা বলে দেখি।'

'আচ্ছা, বলছি গিয়ে। তুমি একটু ঐ আবডালে গিয়ে দাঁড়াও।'

বারিধি অনেক দূর থেকেই সেবাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু তাকে সেবার চেনবার কথা নয়। প্রথমত তার মুখে ঘোমটা, খানিকটা ধিক্কারে, খানিকটা বা সম্ভ্রমের বিজ্ঞাপন হিসেবে। দ্বিতীয়ত, এখন তার রাজবেশ। পায়ে জরির মোটা কাবলি, পরনে নয়ানসুকের ঢিলে পা-জামা, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, তার উপরে কাশ্মিরি ফতুয়া। মাথায় জরির টুপি, বাঁকা করে বসানো। তার উপর, আজকাল সে পায়ে হেঁটে পিছু নেয় না, মোটরে করে সাঁ করে বেরিয়ে যায়।

বারিধি মোটরে করে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। এ কি আশ্চর্য, সেবার কোলে ছেলে। বুকের উপর সে হঠাৎ একটা হাতুড়ির ঘা খেল। তবে কি সে এত দিন ধোঁকা খেয়ে আছে? আজ কি তার জীবনের পরম ক্ষণে সেবা চরম প্রতিশোধ নেবে ঠিক করেছে? ষড়যন্ত্র করেছে তাকে তার ছেলে ফিরিয়ে দেবার জন্যে? ছেলেটা কি মরা, না, বেঁচে আছে? যখন সন্ধ্যায় পুরশ্রী আর সে একসঙ্গে চা খাবে তখনই হয়তো সেবা সেই মরা ছেলেটা তার কোলের উপর ফেলে দিয়ে বলবে, এই নাও তোমার ছেলে! বারিধি ভূত দেখল। বললে, গাড়ি আরো জোরে চালাও।

সেবা চুপ করে বসে আছে প্রতীক্ষায়। বাবু তো এল না, দারোয়ানও নয়। যাই হোক, সামনাসামনি গিয়েই ঠিক হবে একটা। ভারি হাত না হলে আজ সে ফিরছে না কিছুতেই। ভাল একজন ডাক্তার দেখুক,

এই এখন সাধ সুজনের। ক্রমশই সে তলিয়ে যাচ্ছে। রাধাকে বসিয়ে এসেছে তার পাশে। রাধা চেনে সেবার হুদ্দা, কোথায় গেলে ধরতে পারবে তাকে। অবস্থা আরো খারাপ বুঝলে গোলাপ-মাসির জিম্মায় রেখে তাকে ডেকে নিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি। শেষ সময়ে একবার বাহুর জোর দিয়ে আঁট করে বেঁধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তাকে রেখে দিতে চেষ্টা করবে। তার প্রতিজ্ঞার মান রাখবে।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। যদি সত্যিই আপত্তি হয়, ফুটপাতের উপর আলগোছে রেখে যাবে না-হয়। মোক্ষমণি মরেছে। ছেলেটারো অমন কোলে চড়ে বেড়াবার কথা নয়।

সন্ধের মোড়টা দেখে যাবে একবার। না হয়, রাত্রিবেলা গোলাপ-মাসিরই শরণাপন্ন হবে। সন্ধে হতে আর কত বাকি। কতক্ষণে আসবে না জানি দারোয়ান।

হঠাৎ কতগুলি ভারি-ভারি গাড়ি এসে পৌছুলো রাস্তায়। ভিখিরির দলকে টেনে-ঠেলে তুলতে লাগল সেই গাড়িতে। কেউ-কেউ ভয় পেল, কান্নাকাটি সুরু করল। কর্তাব্যক্তির মত লোকেরা অভয় দিতে লাগল যে যাচ্ছে তারা অনাথ-আবাসে, সেখানে খেতে পাবে মাগনা, দূর হয়ে যাবে সব রোগজ্বালা, যা কিছু ভোগান্তি। সুস্থ হলে, সুসময় আসতেই ফেরৎ পাঠাবে তাদের গ্রামে, মিলিয়ে দেবে তাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। তবু মূঢ় জনতা যেন তা বিশ্বাস করতে চায় না। এদিক-ওদিক ছিটকে বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। বলে, গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারবে দেখো।

'এই যে এদিকে। এরা দু' জন।' কে একজন সেবা ও পাশের ঘুমন্ত শিশুটাকে স্পষ্ট আঙুলে দেখিয়ে দিলে।

কে একজন বেহারী-পাঞ্জাবীর মত লোক। সঙ্গে খরসজ্জায় একজন মহিলা। জামাটাই বুকের আবরণ। আঁচলটা বাহুল্য। মুখে উগ্র

কারুকাজ। ওরা কর্তাব্যক্তিদের সাহায্য করছে বোঝা গেল। এই এখন এদের কাজ, দলের কাজ। ফুটো জাহাজকে মেরামতের জন্যে বন্দরের কারখানায় নিয়ে যাওয়া। এই এখন এদের নতুন চাকরি।

সেবা করুণস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমি না, আমি না আমি ভিখিরি নই—'

সমস্ত কথা খতিয়ে দেখবার সময় কোথায়। সঙ্গে যে তার ছেলে, সে যে ফুটপাতে, সে যে কঙ্কালসার এটাই তার ভিখিরিত্বের আপাতপ্রমাণ।

টেনে-ঠেলে তুলে দিল সেবাকে। আর তার ছেলেকে।

বেহারী-পাঞ্জাবীকে চিনতে পেরেছে সেবা। চিনতে পেরেছে তার কণ্ঠস্বরের কাঠিন্যে। চেঁচিয়ে উঠল সে আর্তকণ্ঠে: 'বারিধিবাবু, বারিধিবাবু, আমি। আমি। আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে? আমি কি ভিখিরি?'

পুরশ্রী কৌতূকান্বিত হয়ে বললে · 'এ তোমাকে চেনে দেখছি।'

বারিধি অদৃশ্যায়মান গাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বললে, 'এদের মধ্যে এত রিলিফের কাজ করছি, আর আমার নামটা জানবে না?'



কারুকাজ। ওরা কর্তাব্যক্তিদের সাহায্য করছে বোঝা গেল। এই এখন এদের কাজ, দলের কাজ। ফুটো জাহাজকে মেরামতের জন্যে বন্দরের কারখানায় নিয়ে যাওয়া। এই এখন এদের নতুন চাকরি।

সেবা করুণস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, 'আমি না, আমি না। আমি ভিখিরি নই—'

সমস্ত কথা খতিয়ে দেখবার সময় কোথায়। সঙ্গে যে তার ছেলে, সে যে ফুটপাতে, সে যে কঙ্কালসার এটাই তার ভিখিরিত্বের আপাতপ্রমাণ।

টেনে-ঠেলে তুলে দিল সেবাকে। আর তার ছেলেকে।

বেহারী-পাঞ্জাবীকে চিনতে পেরেছে সেবা। চিনতে পেরেছে তার কণ্ঠস্বরের কাঠিন্যে। চেঁচিয়ে উঠল সে আর্তকণ্ঠে: 'বারিধিবাবু, বারিধিবাবু, আমি। আমি। আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে? আমি কি ভিখিরি?'

পুরশ্রী কৌতুকান্বিত হয়ে বললে: 'এ তোমাকে চেনে দেখছি।'

বারিধি অদৃশ্যায়মান গাড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বললে, 'এদের মধ্যে এত রিলিফের কাজ করছি, আর আমার নামটা জানবে না?'

